মাসুদ রানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

জিম্মি



মাসুদ রানা

জিম্মি

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

প্যারিস।

গাছে ছাওয়া আইল সেইন্ট লুই। সুন্দর রোদ ঝলমলে দিন। ধীর পায়ে, যেন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হেঁটে চলেছে আলবার্তো ভেরিনো। গাছের পাতার ফাঁক গলে মাঝেমধ্যেই একআধ চিলতে রোদ এসে পড়ছে ওর শক্ত সমর্থ চৌকো মুখের ওপর। বয়স ষাটের কাছাকাছি। টুপি পরেনি- তারের মত একমাথা এলোমেলো পাকা চুল। পরনে মোটা কাপড়ের চেক স্যুট। ওয়েস্ট কোটের বোতামগুলো সব লাগানো- ফলে তার ছোট্ট নটের টাইটা কুঁচকে উঁচু হয়ে রয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীর মতই দেখাচ্ছে ওকে এখন। কিন্তু বছর দুই আগেও আলবার্তো ভেরিনো ছিল ফ্রেঞ্চ আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। গত পাঁচ দশকের মধ্যে ফ্রান্সের ক্রাইম জগতে এত বড় প্রতিভা আর উদয় হয়নি। সহকর্মীদের কাছে এখনও সে আগের সম্মানই পায়। সবার সাথে আগেরই মত যোগাযোগ রাখে সে, কিন্তু এখন রিটায়ার্ড।

চলতে চলতেই একবার ঘড়ি দেখল আলবার্তো ভেরিনো। তিনটে বাজছে। এখনও তিন-তিনটে ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে

তাকে। ছটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

কাছেই মডার্ন আর্ট, পোরসিলিন, আর ক্রিস্টাল গ্লাসের দুটো মিউজিয়াম, রোডিন আর ক্লানি। এই দুটোর ওপরই কাজ করবে ঠিক করল ভেরিনো। ঘণ্টা দুই খুব নিষ্ঠার সাথে কাজ করল সে। নোট বই বের করে নোট করল কোথায় কোন্ জিনিসটা নতুন আনা হয়েছে, সেগুলোর সিকিউরিটি ব্যবস্থা কি কি- জানালা দরজা কোন্টার অবস্থান কোথায়। কোন খুঁটিনাটিই বাদ গেল না। এটা তার একটা শখে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজের ঘরে ফিরে অবসর সময়ে ঠিকই সে ওই সব মূল্যবান জিনিস সরাবার ফুলপ্রুফ একটা প্ল্যান তৈরি করবে। ক্রাইম ছেড়ে দেয়ার পরে এই ধরনের মানসিক ব্যায়ামে সে অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি পায়। ইচ্ছে করলেই করতে পারতাম, পুলিস টিকিটিও ছুঁতে পারত না- কিন্তু ছেড়ে দিলাম- বর্তমানে এই ত্যাগেই ওর আনন্দ।

লম্বা একটা শ্বাস নিল ভেরিনো। কি ভালই না লাগে! ধন-সম্পদ পরিবেষ্টিত সব জায়গাতেই কেমন যেন একটা মিষ্টি মধুর গন্ধ থাকে।

মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে সোজা গেল সে তার গাড়ির কাছে। আলভারো পিয়েত্রোর ছদ্মনামে ভাড়া করা হয়েছে গাড়িটা। পিছনের সীটে রাখা সুটকেসটা তুলে নিয়ে নির্বিকার ভাবে গাড়ি লক করে ওটাকে ওখানেই পরিত্যাগ করল। ঘটনাটা ওর মনে কোনই আমল পেল না- ও জানে, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটা হারিয়েছে বলে রিপোর্ট করা হবে- আরও পরে ওটা পুলিস খুঁজে বের করে পৌঁছে দেবে মালিকের কাছে।

পাঁচটা বাজে। সময় হয়ে আসছে। ট্যাক্সি নিয়ে বুলেভার্ড হাউসমানে আর একটা কার রেন্টালে গেল ভেরিনো। সেখানকার

সুন্দরী সেক্রেটারি তাকে হেনরী বুংগার্ট নামে চিনে ফেলল তৎক্ষণাৎ। ওই নামে আগেও এই গ্যারেজ থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়েছে ভেরিনো। তবে ওই সুন্দরীর ওকে মনে রাখার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি ভাড়া করতে এসে গতবার ডোরিনকে আপন মেয়ের মত লাগায় একটা হীরের ব্রোচ উপহার দিয়েছিল সে- মনে থাকার সেটাই কারণ। ডোরিনই সব ব্যবস্থা করল- পনেরো মিনিটের মধ্যে মারসিডিস বেন্জ্-২০০ ড্রাইভ করে রওনা হয়ে গেল ভেরিনো ভারসেই হয়ে র‍্যামবুইল্লের উদ্দেশে। কাছাকাছি একটা বাগানে বসে রুটি আর হ্যামবার্গার খেয়ে নিল।

র‍্যামবুইল্লের গির্জায় ছ'টার প্রথম ঘণ্টার সাথে সাথেই আধো অন্ধকার গির্জার বিরাট দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল আলবার্তো ভেরিনো। ঘণ্টার ধ্বনিতে গমগম করছে হলের ভিতরটা। সন্তর্পণে এগিয়ে গেল সে একসারি কনফেশন বক্সের শেষটার দিকে। বক্সটার হাত ছয়েক দূরে পাথরের মূর্তির মত পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যারি হোম্স্। একেও ডাকা হয়েছে নাকি? ইউরোপের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাভাতে-ফাইটার এ লোক। পিস্তল ছোঁড়াতেও এর জুড়ি মেলা ভার। এই লোক এখানে কেন বুঝতে না পারলেও সৌজন্যের খাতিরে একটু মুচকি হেসে কনফেশন বক্সের লাল পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল ভেরিনো।

চৌধুরী! মনে মনে ভীষণ চমকাল ভেরিনো। কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করল পরিবর্তনগুলো। চোখ দুটো বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে লোকটার। জুলফির কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু চেহারায় আগের মতই প্রতিভার ছটা।

'ফাদার, আমি পাপ করেছি, আমাকে আশীর্বাদ করুন,' বলল

সে কাতর কণ্ঠে।

‘ইন নোমাইন প্যাত্রিস, ফিলি এত্ স্পিরিতাস স্যাঙ্ক...’ প্রিস্টের সাদা জোব্বা পরা ফাদার আউড়ে গেল তার কোড্টা বেশ গাম্ভীর্যের সাথে।

‘হ্যাঁ, এবারে কাজের কথায় আসা যাক, কি বলো, ভেরিনো?’ সময় নষ্ট করার লোক যে ফাদার নয় তা বেশ বোঝা গেল।

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।’ সাগ্রহে সম্মতি জানাল ভেরিনো। বড় কিছু করার মতলব এঁটেছে লোকটা, পরিষ্কার আঁচ করতে পারছে সে।

‘আমার কিছু লোক দরকার। খোঁজ নিয়ে জেনেছি সেরা লোকদের সাথেই তোমার ওঠাবসা।’

‘কি করার জন্যে, বস্?’

‘সেটা সময় মত প্রকাশ করা হবে।’ একটু ধমকের সুরে বলল ফাদার।

‘ঠিক আছে। কতজন কি ধরনের লোক দরকার আপনার?’ নোট বই বের করে নোট নিতে আরম্ভ করল ভেরিনো।

‘তিন জন। একজন অস্ত্র বিশারদ। অবশ্যই তাকে সেরা, আর অভিজ্ঞ লোক হতে হবে।’ নিচু গলায় কথা বলছে কবীর চৌধুরী। ভারী লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে তার চোখ দুটো চার আনা, থুড়ি, দু’টাকা দামের রসগোল্লার মত দেখাচ্ছে।

‘দুই নম্বর চাই আমার সার্কাসের একজন সেরা গেছো লোক, বা মেয়েলোক, যে অনেক উঁচুতে রশি বেয়ে উঠতে পারবে নির্ভয়ে। আর অবশ্যই তাকে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং জানতে হবে।’

খসখস করে নোট লিখে চলেছে আলবার্তো ভেরিনো।

‘তৃতীয় জনকে হতে হবে কমপিউটর প্রোগ্রামিঙের এক্সপার্ট।

খুব শক্তিশালী, আর দড়ি বেয়ে অনেক উপরে ওঠানামায় এক্সপার্ট হতে হবে একেও। বিশেষ করে হাইটের ব্যাপারে নির্ভীক তিনজন লোক আমার দরকার।'

'আর কিছু?' নোট বই থেকে মুখ তুলে ফাদারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ভেরিনো।

'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর এল।

'খরচা হবে বেশ।' মাথার পিছনটা একটু চুলকিয়ে নিয়ে জানাল ভেরিনো।

'খরচ যা লাগে আমি দেব। কাজ পছন্দ হলে খুশি করে দেব।'

'ঠিক আছে, টাকা আপনি দেবেন- সেরা লোকই আমি সাপ্লাই দেব।'

'একমাস সময়- একমাস পর আমার লোক তোমার সাথে যোগাযোগ করবে।'

মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে উঠে দাঁড়াল আলবার্তো ভেরিনো। তার হাতের টানে পর্দার ব্রাস রিংগুলো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে বেজে উঠল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চার্চের আধো অন্ধকার হলঘরে এসে দাঁড়াল। দেখল এখনও দাঁড়িয়ে আছে ব্যারি। বেরিয়ে আসার সময়ে লক্ষ করল অন্য একটা পর্দার আড়াল থেকে আরও এক জোড়া চোখ তার ওপর সতর্ক নজর রেখেছে। রাস্তায় নামল ভেরিনো। একটু এগিয়েই বুঝল ফেউ লেগেছে পিছনে।

দুই

স্টুটগার্ট থেকে আটাশ মাইল পশ্চিমের এই উঁচু মাঠটা খুব নির্জন- চারদিকে গাছপালা এত ঘন যে ওগুলো রাস্তা থেকে একদম আড়াল করে রেখেছে জায়গাটাকে। ইউ এস আর্মি তাই এটাকে ল্যাপ লেজার গান পরীক্ষা করার জন্যে একটা আদর্শ স্থান বলে বেছে নিয়েছে।

চারটে ল্যাপ লেজার নিয়ে ওরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে স্টুটগার্টে। বেশি নয়, এটা ঠিক, তবে জেনারেল ইলেকট্রিক মোট মাত্র বারোটা ল্যাপ লেজার তৈরি করেছে- এখনও গবেষণা পর্যায়ে আছে সব। বাকি আটটা নিয়ে পরীক্ষা চলছে অন্য জায়গায়। প্রতিদিন হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসা হয় ল্যাপ লেজার এই মাঠে। কাজ শেষ হলে আবার সন্ধ্যায় হেলিকপ্টারে করেই ফেরত যায় ওগুলো স্টুটগার্ট বেসের কঠোর নিরাপত্তায়। ল্যাপ লেজার গানগুলো খুবই শক্তিশালী আর বিপজ্জনক বলে স্টুটগার্ট ঘাঁটিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো মোটেও নিরাপদ নয়। তাই এই ব্যবস্থা।

ওগুলো চালাতে হলে অনেক পাওয়ারের দরকার। বড় বড় জেনারেটর নিয়ে টানাটানি না করে এই নির্জন জায়গায় একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসিয়ে নিয়ে বেশ সুন্দর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ওরা

লোকচক্ষুর অন্তরালে।

চোখ দুটো ছোট করে দূরে মেঘের মধ্যে হেলিকপ্টারটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল কর্নেল। ঘাড় ফিরিয়ে ল্যাপ লেজারগুলো আরেকবার দেখে নিল। নিজের হাতেই স্ট্রিপ করে ভাল মত প্যাক করেছে সে- চারটেই এখন রিটার্ন ট্রিপের জন্যে রেডি।

সেকেন্ড ইন-কমান্ড পাশে এসে দাঁড়াতেই তার দিকে চেয়ে চোখ টিপে ঘাড় নেড়ে হাসল কর্নেল, 'সত্যিই, সাংঘাতিক জিনিস বানিয়েছে ব্যাটারা- কি বলো?' প্রশ্নের চেয়ে মন্তব্যের মতই শোনাল কথাটা।

মেজরের মুখে সব সময়েই মোটা চুরুট ঝুলে থাকে। চুরুটের ফাঁক দিয়ে একটা সম্মতিসূচক শব্দ বের করল সে।

ইউ এস আর্মির বড় বড় জেনারেলও ল্যাপ লেজার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিস্ময়ে হতবাক হবে তারা এই অস্ত্রের গুণাগুণ জেনে। তাদের এই বিশেষ জ্ঞানের জন্যে বেসের প্রধান অস্ত্র শিক্ষক আর তার স্টাফ মনে মনে গর্বই অনুভব করে। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে ব্যালেস্টিক বা অ্যারোডাইনামিক্স্-এর উন্নতি সাধনের ফলে এই ল্যাপ লেজারের জন্ম হয়নি, হয়েছে অপটিক্স-এর কারণে। সাধারণের মাথা গুলিয়ে দেয়ার জন্যে এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট।

আজ সারাদিন বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোর পরে দিনের শেষে লেজার গানাররা ধরেছে ইন্সট্রাক্টরকে, লেজার বীম দিয়ে এক হাজার মিটার দূরে চার ইঞ্চি স্টীল প্লেট কেটে USAAF লিখবে তারা। আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখল স্টেনসিল দিয়েও এত পরিষ্কার সুন্দর লেখা সম্ভব ছিল না। চার ইঞ্চি পুরু স্টীল প্লেট কেটে পরিষ্কার USAAF লিখেছে লেজার বীম।

ল্যাম্প লেজারে গাইডেন্স সিসটেম অনেকটা কনভেনশনাল রাডারের মতই। শুধু এক জায়গায় তফাৎ- সেটা হচ্ছে টারগেট খুঁজতে রেডিও ওয়েভের জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে লাইট ওয়েভ। যে কোন রকম টারগেট বেছে নিতে পারে ওর ইঁদুরের কানের মত বিদঘুটে দুটো জিনিস। ডজন খানেক ধাতু থেকে শুরু করে কাঠ, ইঁট, মানুষ পর্যন্ত চেনার জন্যে টিউন করা আছে কমপিউটর।

টারগেট চিনে নেবার সাথে সাথেই ল্যাপ লেজার থেকে বেরিয়ে আসে রাত্রির চেয়েও কালো এক মারাত্মক রশ্মি। সামনে যা পড়বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মুহূর্তে।

সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো স্পীড। সাধারণ ইলেকট্রনিকসে ন্যানো সেকেন্ডেই (অর্থাৎ এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক মিলিয়ন ভাগ) কাজ চলে। আরও স্পীড দরকার হলে লাইট ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে পিকো সেকেন্ড বা মাইক্রো-মাইক্রো সেকেন্ড (অর্থাৎ সেকেন্ডের এক মিলিয়ন ভাগের এক মিলিয়ন ভাগ) গতি সম্ভব হয়। ল্যাপ লেজার টিউন করা হয়েছে পিকো সেকেন্ডে। এটা মানুষের উপলব্ধির বাইরে। অপটিক্যাল সিসটেমটাকে ল্যাপ লেজারের গতির সমতুল্য করার জন্যে জেনারেল ইলেকট্রিক কমপিউটর প্রসেসরের মধ্যে লবণের দানার মত ছোট ছোট মিনি লেজার ব্যবহার করেছে। একটা পুরো আর্মিকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে এক একটা ল্যাপ লেজারের।

কালো বুইকটা ছুটে চলেছে হাইওয়ে ধরে। আউসগ্যাঙ-স্টুটগার্ট রোড সাইনটা পড়ল ডেভিড ফ্রস্ট। এবার ডান দিকের রাস্তাটা

ধরে সরে এল সে হাইওয়ে ছেড়ে।

একবার দায়িত্ব নিলে কখনও কোন কাজে গাফিলতি করে না ডেভিড। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সে তাই তৈরি করেছে পরিকল্পনা। কাজটা নিখুঁত ভাবে করার জন্যে আলবার্তো ভেরিনো তাকে ভাল তো বটেই, রীতিমত উদার হাতে টাকা দিয়েছে। তাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, এটা কেবল শুরু; আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে ওকে ভবিষ্যতে, বিনিময়ে আরও অনেক গুণ বেশি টাকা দেয়া হবে। দেবে না-ই বা কেন, আলবার্তো ভেরিনো ভাল করেই জানে এই কাজে ডেভিডের জুড়ি নেই। প্রাক্তন সি আই এ এজেন্ট হিসেবে জটিল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে ইউ এস আর্মি ট্রেনিং আছে ওর।

টাকা জুগিয়েছে কবির চৌধুরী, ভেরিনোর মাধ্যমে। চুরির ব্যাপারেও বেশির ভাগ তথ্য সরবরাহ করেছে সে-ই- কিন্তু পরিকল্পনাটা ডেভিডের নিজস্ব, তবে আস্তানায় নিয়ে গিয়ে আদ্যোপান্ত শুনে অনেক ভেবে-চিন্তে তারপর ও.কে. করেছে কবির চৌধুরী। ডেভিডও হাজারবার করে উল্টেপাল্টে দেখেছে প্ল্যানটা- কোন ফাঁক নেই। নিখুঁত।

ট্রাইপডে বসানো লেজার গাইডেড ইলেকট্রনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে ইউ এস আর্মি গার্ড রূম থেকে বর্তমান সপ্তাহের পাসওয়ার্ডগুলো ইতোমধ্যেই জেনে নিয়েছে ডেভিড। ও জানে, পাসওয়ার্ড ছাড়া কারও পক্ষে হেলিকপ্টার পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব। নিষিদ্ধ এলাকা ওটা- টপ সিকিউরিটি জোন।

ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে আরও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছে ডেভিড। অফিসার্স মেসের বড় বড় ভিজিটিং অফিসারদের কোয়ার্টার দেখেছে। কারণ গার্ডদের কাছে তাদের চেহারা একটু

অপরিচিত হবে। একজন অফিসারকে টারগেট করে সম্পূর্ণ নতুন এক সেট কাগজ-পত্র আর আইডেন্টিটি কার্ডও বানিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে ড্রাইভ করছে ডেভিড। বেসের ভিতরই পাবলিক রোড ধরে নিষিদ্ধ এলাকা থেকে দূরে অফিসার্স কোয়ার্টারের পাশে পার্ক করল গাড়িটা।

দশ মিনিট পর ইউ এস আর্মি জেনারেলের পোশাক পরা এক লোক বের হলো অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে। দ্রুত হেঁটে অফিসার্স ক্লাবের দিকে এগিয়ে গেল সে। বগলে একটা বান্ডিল, বাঁ হাতে একটা ব্রীফকেস। ঘড়ি দেখে একবার আকাশের দিকে চাইল- তারপর ক্লাবের পিছনে পার্ক করা জীপটার দিকে পা বাড়াল।

ন্যূড ম্যাগাজিনটা ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গার্ড কর্পোরাল। জীপটা ততক্ষণে চাকার কর্কশ শব্দ তুলে গার্ড রূমের পাশে এসে থেমেছে। দরজার কাছে পিছন থেকে একজন সৈনিক এসে দাঁড়াল। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে বাইরে। দুজনেই পিট পিট করে চেয়ে ঠাওর করার চেষ্টা করছে। দূর থেকে হেলিকপ্টারের পত্ পত্ শব্দ কানে আসছে।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে নামল ডেভিড জীপ থেকে। গার্ড রূমের লাইট পড়ে জেনারেলের স্টারগুলো ঝিকমিক করে জ্বলে উঠল। নিজের অজান্তেই কর্পোরালের হাতের মুঠো আরও শক্ত ভাবে বসল তার এম ওয়ান কারবাইনের উপর।

'হল্ট!' চিৎকার করে উঠল কর্পোরাল।

থামল ডেভিড, কিন্তু সাথে সাথেই অসন্তুষ্ট চড়া গলায় বলল, 'কর্পোরাল! ইমার্জেন্সী! আমার খুব তাড়া!'

'সামনে এসে পরিচয় দিন।' কর্পোরাল তার ডিউটিতে অটল।

গজগজ করতে করতে সামনে এগুলো ডেভিড। জি আই

দুজন দেখল লম্বা শক্ত চেহারার এক অপরিচিত মুখ। চেহারায় কেমন একটা উদ্ধত ভাব। অবশ্য জেনারেলদের মুখের ভাব সচরাচর ওই রকমই থাকে।

'নাও, তাড়াতাড়ি করো,' খেঁকিয়ে উঠল ডেভিড।

স্পাসওয়ার্ড?' কর্পোরাল জিজ্ঞেস করল।

'খেলা পেয়েছ? নিয়ম কি আমার আগে বলার?' ধমক দিল মাইক।

'গ্রীষ্মের ছুটি।' একটু দমে গিয়ে আউড়াল সে।

'বুধবারের গান।' বলে পরিচয় পত্রগুলো বাড়িয়ে দিল মাইক। জেনারেল এল সি বুমার। মনে পড়ে গেল কর্পোরালের- এই সেই অস্ত্র এক্সপার্ট। গত তরশু মাত্র এসেছে। খটাশ করে বুটের শব্দ তুলে স্যালিউট করল কর্পোরাল। 'ইয়েস স্যার, জেনারেল।' ওর সঙ্গী ততক্ষণে ব্যারিয়ার তোলার জন্যে বোতাম টিপে দিয়েছে।

এক লাফে জীপে উঠে ঝড়ের বেগে ভিতরে ঢুকে গেল ডেভিড। হেলিকপ্টারের কাছাকাছি এসে জোরে ব্রেক কষে জীপ থামাল। 'সবাই সরে যাও এখান থেকে- এক্ষুণি।' চিৎকার করে বলল সে।

জেনারেলের স্ট্রাইপ দেখেই কর্পোরাল ইন-চার্জ তার বাজখাঁই গলায় আদেশ করল, 'টেনশান!' সাথে সাথে তিনজনই ঋজু মূর্তিতে পরিণত হলো।

হাতের বান্ডিলের মোড়ক খুলে একটা র‍্যাডিয়েশন স্যুট বের করে পরতে পরতে চিৎকার করল ডেভিড, 'ইমার্জেন্সী, কর্পোরাল। র‍্যাডিয়েশন লীক। এক্ষুণি সরে যাও এখান থেকে তোমার লোকজন নিয়ে।'

'স্‌ স্যার আ-আপনার পরিচয়টা?' আমতা আমতা করে

জিজ্ঞেস করল কর্পোরাল।

'জেনারেল এল সি বুমার। থার্ড আর্মি স্পেশাল ওয়েপনস্ ডিভিশন। নাউ অন দা ডাবল সোলজার, মুভ ইট।' তাড়া দিল ডেভিড।

জেনারেলের র‍্যাডিয়েশন স্যুট দেখে আর কথাবার্তায় রীতিমত ভয় পেয়েছে ওরা। দ্রুত সরে পড়ল সবাই। জীপের পিছন থেকে একটা গায়গী কাউন্টার বের করে পরীক্ষা শুরু করল সে। পাইলট এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ করছিল জেনারেলের কার্যকলাপ। মাথা নামিয়ে রোটর ব্লেডের নিচে দিয়ে গিয়ে চপারের দরজা খুলল ডেভিড। 'র‍্যাডিয়েশন লীক! শিগ্‌গির নামো! তোমাকেও ধরে থাকতে পারে!' ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি সুইচ অফ করতে যাচ্ছিল পাইলট। বাধা দিল ডেভিড, 'না, সুইচ অফ কোরো না-হেলিকপ্টারটাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে আমাকে। ইমার্জেন্সী মেডিক্যাল ইউনিট আসছে তোমাদের সবাইকে পরীক্ষা করতে।' আর বেশি বলতে হলো না পাইলটকে। একলাফে নেমেই ঝেড়ে দৌড় দিল সে।

গার্ড রুমের কাছে একটানা হর্ন বাজছে। সবার মনোযোগ এখন ওই দিকে। এদিকে ডেভিড টেক্ অফ করার জন্যে রোটর স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে।

দুটো জীপ ছুটে আসছে লঞ্চ প্যাডের দিকে। প্রথম জীপ থেকে এক পশলা গুলি বর্ষণ হলো।

গুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সৈনিক আর পাইলট সবাই শুয়ে পড়ল মাটিতে। বেঘোরে প্রাণ খোয়াতে রাজি নয় কেউ।

হেলিকপ্টারের গায়ে লেগে পিং পিং শব্দ তুলে গুলিগুলো ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা গুলি ডেভিডের র‍্যাডিয়েশন স্যুটের

কিছুটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্যথা অনুভব করল না সে, অর্থাৎ, গায়ে লাগেনি। ব্রীফকেসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেভিড। তার হাতে এখন ভারী স্মাইজার মেশিন পিস্তল। দুটো গাড়ির হেডলাইটই ডেভিডের ওপর। দেখতে পাচ্ছে না সে ভাল করে। সহজ টারগেটই বেছে নিল সে। পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফাটার বিকট শব্দ উঠল। জি-আই-রা জীপের আড়ালে নিরাপদেই থাকল। কিন্তু এখন আর ডেভিডকে ঠেকাবার সাধ্য কারও রইল না। আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল হেলিকপ্টার।

নিচ থেকে ট্রুপের লোকজন তখনও পাগলের মত হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে- কিন্তু সবই বৃথা। রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে ডেভিড। সবগুলো ল্যাপ লেজারই হাতছাড়া হয়ে গেল- কোন উপায় নেই এখন ওগুলো উদ্ধারের। হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে গোলাগুলি বন্ধ করার নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন।

'ওটা কোন্ জেনারেল ছিল, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'ভুয়া।' একটু ধরা গলায় জবাব দিল ক্যাপ্টেন। 'আর যেই হোক, ও ব্যাটা জেনারেল বুমার নয়। আর্মি অফিসার্স ক্লাবে জেনারেল বুমারের কাছ থেকেই আসছি আমি। তাঁর একটা ইউনিফর্ম খোয়া গেছে। জীপটা চুরি যেতেই খবর পেয়ে ধাওয়া করেছিলাম আমি।'

টুপিটা মাথার ওপর একটু টেনে ঠিক মত বসিয়ে কোমরে দুহাত রেখে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা চাপা শিস বেরিয়ে এল, 'ও ব্যাটা যে-ই হোক, খেলা একটা দেখিয়েছে বটে- স্বীকার করতেই হবে। ভাবতে পারো কি লঙ্কাকাণ্ড বাধবে যখন ওপরওয়ালারা জানবে তাদের প্রিয় খেলনার একটা নয়, চার-চারটেই হাইজ্যাক হয়ে গেছে?'

‘তাহলে কি হবে, স্যার, চোটটা তো আমাদের ওপরই আসবে?’ প্রশ্ন করল কর্পোরাল। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত সে।

‘নাহ্, আমাদের কি হবে? সিকিউরিটি ব্যবস্থার সাথে আমাদের কোন যোগ নেই। বড়য় বড়য় ফাইট হবে- এতে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আমরা আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেছি।’ প্রবোধ দিল ক্যাপ্টেন। সে নিজেও খুব একটা স্বস্তি বোধ করছে না। নিজের মনেই সপক্ষে যুক্তি খুঁজছে সেও। সে জানে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর রীতি সব দেশেই সর্বকালেই আছে।

ডেভিডের পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল ইউ এস আর্মির কাছে। বুইকটা চুরি করা- কোথাও কোন আঙুলের ছাপ নেই। ফেলে আসা কাপড়গুলো চেইন স্টোর থেকে কেনা। কোথাও কোন চিহ্ন না রেখে ভূতের মতই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা।

মিনিট পনেরো পুবদিকে উড়বার পর নিচের দিকে নেমে এল ডেভিড। গাছের মাথা ছুঁই ছুঁই করে উড়ছে হেলিকপ্টার- তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার নিচের দিকে।

অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে আর নিভছে একটা আলো। ল্যান্ডিং লাইট ফ্ল্যাশ করতেই উত্তর এল- তিনটে গাড়ির তিন জোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠল একসাথে।

হেলিকপ্টারটা দক্ষ হাতে দ্রুত নিচে নামিয়ে ল্যান্ড করল ডেভিড মাঠের মাঝখানে। তিন দিকে তিনটে গাড়ি। একটা গাঢ় রঙের বড় সিট্রন, একটা ফোক্সওয়াগেন আর তৃতীয়টা একটা ছোটখাট শক্ত গোছের পিক্আপ ট্রাক।

মাটিতে লাফিয়ে পড়েই সিট্রনের দিকে গেল ডেভিড। আগেই

নির্দেশ ছিল সে রকম। নিঃশব্দে সামনের জানালার কাঁচটা নিচে নেমে গেল। শোফারের জামা পরে ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে ব্যারি হোম্‌স্‌।

'মাল পেয়েছ?' ছোট্ট প্রশ্ন করল ব্যারি।

'হুঁ।' আরও ছোট জবাব দিল ডেভিড।

'খুশির কথা,' বলেই পাশের দিকে ঝুঁকে সামনের সীটে রাখা একটা নরম বান্ডিল আর ম্যাট লেদারের একটা ব্রীফ্‌কেস ধরিয়ে দিল সে ডেভিডের হাতে। 'জামা-কাপড়, তোমার সাইজেরই। কেসের ভেতরে পাবে টাকা আর ফোক্সওয়াগেনের চাবি। লেজার নিয়ে তোমার আর চিন্তা করতে হবে না, আমরাই ওগুলো ট্রাকে তুলে নেব। ফেজ টুর সময়ে আবার তোমাকে খবর দেয়া হবে। এখন গা ঢাকা দাও।' সোজা সাপ্টা নির্দেশগুলো বলে গেল ব্যারি।

ব্রীফকেস খুলে ইউ এস ডলারের তোড়াগুলো দেখে হাসি ফুটে উঠল ডেভিডের ঠোঁটে। বলল, 'ধন্যবাদ।' গাড়ির পিছনের সীটে বসা লোকটাকে চিনবার চেষ্টা করল, কিন্তু একে অন্ধকার, তার ওপর টিনটেড্‌ গ্লাস। কিছুই দেখা গেল না। একটা কথাও বলেনি লোকটা।

গাড়ির কাঁচ উঠিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল ব্যারি, 'আমি লেজারগুলো পিকআপে তুলে ওয়্যার হাউসে নিয়ে যাচ্ছি, স্যার।'

'ঠিক আছে।' এতক্ষণে কথা বলল কবির চৌধুরী। 'রবার্টকে নিয়ে আমি হোটেলে ফিরছি- ওখানে আমার সাথে দেখা করবে তুমি পরবর্তী নির্দেশের জন্যে। রবার্টকে বলো আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিতে।'

'হেলিকপ্টারটা?' আদেশের অপেক্ষায় ব্যারি।

'ইউনিফর্ম আর র‍্যাডিয়েশন স্যুটসহ ওটাকে উড়িয়ে দাও।' নির্বিকার ভাবে নির্দেশ দিল কবির চৌধুরী।

মাইলখানেক যেতে না যেতেই পিছন থেকে হেলিকপ্টার বিস্ফোরণের শব্দ শুনল ডেভিড- রিয়ার ভিউ মিররে আগুনের ফুলকিগুলোও স্পষ্ট দেখল সে। মনে মনে ভাবল, সত্যিই গুছিয়ে কাজ করতে জানে কবির চৌধুরী।

তিন

রোম।

সম্ভ্রান্ত নাইট ক্লাব গ্যাট্টোপারদোর সামনে গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করছে ব্রাইট সার্কাসের তারকা মিস সুজানা মনরো, ওরফে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের রূপা। তার স্পোর্টস মডেল জাগুয়ারটা আনতে গেছে অ্যাটেনডেন্ট।

হাত তিনেক দূরেই দুজন সুন্দর স্মার্ট চেহারার গ্রীক যুবক তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের তর্কের বিষয়বস্তু হলো দুজনের মধ্যে কে এই সুন্দরীকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করবে।

পার্কিং অ্যাটেনডেন্ট জাগুয়ারটা রূপার সামনে এনে থামাল। ছোট্টখাট্ট মানুষটা- ফিটফাট জামা-কাপড় পরা- গোঁফে আবার মোমও লাগিয়েছে। লাফিয়ে নেমে দরজাটা পুরো খুলে ধরল রূপার

জন্যে। গাড়ির সীটে বসে একটা নোট বাড়িয়ে দিল রূপা লোকটার দিকে। ভাল বকশিশ পেয়ে ঝুঁকে নত হয়ে অভিবাদন জানাল। সুন্দরী মহিলার বুকের অনাবৃত অংশ কাছে থেকে একটু দেখে নেয়ার সুযোগ ছাড়ল না সে।

পকেট থেকে একটা লম্বা গোছের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল লোকটা, ‘এক ভদ্রলোক আপনার জন্যে রেখে গেছেন।’

‘কে? পরিচয় দিয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল রূপা।

‘না।’ ভীষণভাবে কাঁধ নেড়ে সে জানাল এর আগে কোনদিন তাকে দেখেনি। ‘বললেন, মিস সুজানা মনরোর হাতে দেবে এ প্যাকেট।’

‘আচ্ছা, ধন্যবাদ।’ প্যাকেটটা খোলার দিকে মনোযোগ দিল রূপা। পার্ক অ্যাটেনডেন্ট সিদ্ধান্ত নিল আর দাঁড়ানো ভাল দেখায় না।...ধীরে ধীরে পিছনে সরে গেল সে।

প্যাকেট খুলতে খুলতেই আড়চোখে রূপা লক্ষ করল তর্ক করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, ভদ্রলোকের মত টস্ করেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করবে বলে ঠিক হয়েছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে পার্ক অ্যাটেনডেন্ট বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে বলল, ‘বেল্লা, বেল্লিসিমা।’ অবশ্য সঙ্গত কারণ আছে ওই মন্তব্যের। এমন শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না।

প্যাকেট থেকে বেরুল একটা প্লেনের টিকেট, প্যারিসের। সাথে রয়েছে পঞ্চাশটা একশো ডলারের নোট। না- আরও আছে। একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে লেখা, রিপোর্ট টু প্যারিস। নিচে দুটো অক্ষর, কে. সি।

টসে জিতে একজন রূপার দিকে আসছে, অন্যজন প্রবল

আপত্তি জানাচ্ছে, দান দান তিন দান হওয়া উচিত।

হাসি হাসি মুখ করে অনেক আশা নিয়ে আসছিল ছেলেটা রূপার দিকে। তাকে অপ্রতিভ আর হতবাক করে নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। রূপার মাথায় এখন অন্য চিন্ত া।

আপার ম্যাডিসন এভিনিউ। নিউ ইয়র্ক। ফিফ্‌থ্‌ এভিনিউ-এর মত এখানেও বিচিত্র সব ছোট ছোট দোকানের সমারোহ। বেশির ভাগ দোকানেই খুব দামী আর অদ্ভুত সব জিনিস বিক্রি হয়। ছিটেফোঁটা বিশিষ্ট আর্ট গ্যালারিও আছে ম্যাডিসন এভিনিউ-এ। বিশিষ্ট ঠিক সম্ভ্রান্ত অর্থে নয়- কিম্ভূতকিমাকার অর্থে। অর্থাৎ এরা কিছু এজেন্ট নিয়োগ করেছে আফ্রিকায়, তারা আফ্রিকার গ্রামের গণ্যমান্য লোকেদের কোন না কোন উপায়ে ঘুষ দিয়ে যত সব হাবিজাবি জিনিস সংগ্রহ করে খুব অল্প দামে- পরে সেগুলো ম্যাডিসন এভিনিউ-এ বিক্রি হয় এক একটা ছয়শো ডলার করে! খুঁজলে এইসব দোকানে আফ্রিকায় বিশেষ পদ্ধতিতে সঙ্কুচিত মানুষের মাথাও পাওয়া যাবে।

ইদানীং মাসুদ রানা প্রতিদিন একবার করে এইসব দোকানে চক্কর দেয়। কেনে কমই, শুধু ঘুরে ঘুরে নতুন কি এলো দেখে। এইসব দোকানের সব রিসেপশনিস্টই এখন রানাকে চেনে। অবশ্য অন্য নামে।

‘প্রিমিটিভ ইনকরপোরেটেড’ এমনি একটা ছোটখাট আর্ট গ্যালারি। রানা ঢুকতেই রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলে উঠল, ‘গুড মর্নিং, মিস্টার উডকক।’

‘অ্যান্ড সেম টু ইউ, মিস মেরী লু,’ জবাব দিল রানা।

‘বাহ্, কবিতার মত ছন্দটা মিলেছে তো?’ হাসতে হাসতে বলল মেরী।

ওর কথাকে আমল না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, ‘খবর কি, সুন্দরী?’

‘হ্যাঁ, খবর আছে। ভাগ্যবান পুরুষ আপনি, আপনার জন্যে একটা প্যাকেট এসেছে। ওই পেছনের ঘরে রেখেছি আমি।’

রিসেপশনিস্টের ডেস্ক পার হয়ে পেছনের কামরায় পৌঁছল রানা। প্রধান গ্যালারির পরে এটা একটা বিশেষ গ্যালারি। সাধারণের জন্যে এই গ্যালারি নয়। কেবলমাত্র অতিমাত্রায় ধনী খদ্দেরদেরই এখানে আনা হয়। বুঝেশুনেই মালিক এই ব্যবস্থা করেছে। এই ঘরের শেলফগুলো পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করা দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে ভরা। জিনিসগুলো সবই খাঁটি। বড়লোকেরা আসে- বেশির ভাগই রগচটা, পাগলাটে, খামখেয়ালী বড়লোক। জিনিস পছন্দ করে, মালিক ইচ্ছামত দাম হাঁকে- সে জানে টাকা তাদের কাছে বড় কথা নয়, জিনিসটা মনে ধরেছে, যে কোন মূল্যেই হোক ওটা তার চাই।

ভিতরে ঢুকেই রানার চোখে পড়ল অপূর্ব সুন্দর আর দামী ওক্ টেবিলটার ওপর রাখা ছোট্ট একটা প্যাকেট। উপরে তার নামই লেখা, মানে, বর্তমানে যে নামে পরিচিত সে। টেবিলের ধারে মেহগনি কাঠের চেয়ারটায় বসে প্যাকেট খুলে ফেলল সে। ভিতরে পাঁচটা হাজার ডলারের নোট, একটা প্যারিসের টিকেট আর একটা ছোট্ট নোট। তাতে লেখা, রিপোর্ট টু প্যারিস। কে. সি।

ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল রানা। এর অপেক্ষাতেই ছিল সে গত একটি মাস।

হোটেলে ফিরে একটা লং ডিসট্যান্স কল বুক করল সে।

চার

ওয়াশিংটন।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পিছনে একটা ফাইলে ডুবে আছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ্ রাহাত খান। তাঁর সামনে টেবিলের উপর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে তিন রঙের তিনটে টেলিফোন।

একটা ট্রেতে করে দুই কাপ কফি নিয়ে কামরায় ঢুকল সোহানা। রাহাত খানের ডান দিকে এক কাপ কফি নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে একটা চেয়ার টেনে ডেস্কের সামনে বসল সে। ফাইল থেকে মুখ না তুলেই কফিতে একটা চুমুক দিলেন রাহাত খান।

কফিতে চুমুক দিয়েও তাঁর ভুরু কুঁচকাল না দেখে আশ্বস্ত হলো সোহানা। কফিটা ভালই হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।

সত্যি ভাল কফি তৈরি করে সোহানা। অনেক যত্ন নিয়ে করে। পানি ফুটবার ঠিক আগে আগেই কেতলি নামিয়ে নিয়েছে আজও- ওর এক সায়েন্স পড়া বান্ধবী ওকে শিখিয়েছে এটা- এতে নাকি পানির কারবোনেট আর বাই কারবোনেটগুলো প্রেসিপিটেট করার সুযোগ পায় না, তাই স্বাদ ভাল হয়। ডিমেরারা চিনি এক চামচ

দিয়ে নেড়ে ফাইনাল টাচ্ দিয়েছে সে মেপে কয়েক ফোঁটা রেমি মার্‌টিন দিয়ে।

এতক্ষণে মুখ তুলে চাইলেন রাহাত খান। সামনে সোহানাকে দেখেই জানতে চাইলেন, 'লিস্ট কই?'

'দেখছি।'

ইন্টারকমের সুইচ টিপতেই সাথে সাথে জবাব এল, 'ইয়েস, বস্?'

'লিস্ট কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'টাইপ প্রায় শেষ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নিয়ে আসছি,' বিনীত কণ্ঠে জবাব এল।

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল সোহানা।

বেশ বড়সড় একটা কামরা। বিভিন্ন দেশের তিনজন টেকনিশিয়ান বসে আছে গদিওয়ালা ঘূর্ণি-চেয়ারে। পাইলটের মত প্রত্যেকের মাথায়ই হেড-সেট লাগানো। মাউথ পীসটা মুখ থেকে ইঞ্চি দেড়েক দূরে শূন্যে ঝুলছে। নানান দেশ থেকে রুটিন রেডিও কলের খবরদারি করছে ওরা। দরকার মত জবাব আর নির্দেশ দিচ্ছে বিভিন্ন ভাষায়। বসের সাথে কনসাল্ট করে নিচ্ছে জটিল বিষয় হলে। কম করে হলেও তিরিশটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে তিনজনই। মাঝে মাঝে সামনে রাখা কার্ট্রিজ পেপারে লিখে নিচ্ছে- খবরের সারাংশ। ওদের সামনের সারা দেয়াল জুড়ে রয়েছে নিয়ন লাইটের একটা ওয়ার্ল্ডম্যাপ। কোন কল এলেই যতক্ষণ কথা চলতে থাকে ততক্ষণ ম্যাপের ওপর ওই শহরটা ফ্ল্যাশ করে।

ঠিক একই জিনিস, তবে অনেক ছোট- ছয় ইঞ্চি উঁচু আর নয় ইঞ্চি চওড়া, রয়েছে মেজর জেনারেলের ঘরে। নতুন কোন কল

এলেই মধুর একটা ঘণ্টা বেজে উঠে জানিয়ে দেয় নতুন আর একটা রেডিও কল্ এল।

ব্যক্তিগত অনুরোধ করে কয়েকটা দেশের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেলকে রাজি করিয়েছেন ইউনাকোর ভার নিতে। UNACO মানে ইউনাইটেড্ নেশনস্ অ্যানটি ক্রাইম অরগ্যানাইজেশন। 'অ্যানটি ক্রাইম' কনফারেন্সে বক্তৃতা কালে তিনি নিজেই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর সেরা আর দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল- যাদের ক্রাইম করাটা শুধু পেশা নয়, নেশা হয়ে গেছে; তাদের গতিবিধির উপর নজর রেখে তাদের দমন করার জন্যে একটা সক্রিয় ইউনিট থাকা দরকার। এর পরেই সৃষ্টি ইউনাকোর। ছয়-সাতটা দেশের প্রেসিডেন্টের অনুরোধে বাধ্য হয়েছেন রাহাত খান ইউনাকোর ভার নিতে। অরগ্যানাইজেশন গুছিয়ে দেয়ার পর প্রতি দুই মাস অন্তর রাহাত খান দিন সাতেকের জন্যে আসেন, দেখা-শোনা করে যান। ইমার্জেন্সী হলে তাঁকে রেডিওতে খবর দিয়ে মাঝে মধ্যে নিয়ে আসা হয়।

দুবার নক করে কামরায় ঢুকল ছেলেটা। ওর হাতে টাইপ করা আজ দুপুর পর্যন্ত রেডিও কলের সারাংশ। সোহানার দিকে এগিয়ে দিল সে কাগজটা। এটাই নিয়ম। পড়ে দেখে শুধু গুরুত্বপূর্ণগুলো নিয়ে আলাপ করবে সে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে। কাগজটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে মুখ খুলল সোহানা। 'রিপোর্ট করা হয়েছে বেশ কিছু হীরে হাত বদল হয়েছে। কেপ টাউন থেকে গতকাল প্রায় দুই মিলিয়ন পাউন্ড দামের আকাটা হীরে খোয়া গেছে। বাহকের পরিচয় জানা যায়নি।'

'ট্র্যাক করছে কে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'আমরাই।' জবাব দিল সোহানা।

‘ঠিক আছে। কোড ব্লু। ইন্টারপোল অ্যামস্টার্ডামকে টেকওভার করতে বলো।’

মার্জিনে গোটা গোটা অক্ষরে নির্দেশ লিখে দিল সোহানা।

‘জরুরী খবরের মধ্যে শেষ খবর হচ্ছে, কবির চৌধুরী পশ্চিম জার্মানী থেকে ফ্রান্সে ফিরে গেছে।’

‘হুঁ,’ গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। এটাই আন্দাজ করেছিলেন তিনি। রূপা আর রানা রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হয়েই আছে। আলবার্তো ভেরিনোর কাছ থেকে সব রিপোর্ট পেয়েছেন মেজর জেনারেল। ‘এবার কি খেলা দেখাবে কবির চৌধুরী? স্টুটগার্ট থেকে ইউ এস আর্মির চারটে অত্যাধুনিক ল্যাপ লেজার গান চুরি গেছে।’ স্বগতোক্তি করে আবার কবির চৌধুরীর ফাইলে ডুবে গেলেন রাহাত খান।

ইউনাকোর কাজে রাহাত খান কেবল প্রথম শ্রেণীর এজেন্টদেরই ব্যবহার করেন। প্রত্যেকটা দেশের সেরা বাছাই করা কয়েকজন এজেন্ট কাজ করে ইউনাকোর জন্যে। এতে খুব ভাল ফলও পেয়েছেন তিনি। ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটা প্রোজেক্ট-এর কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন।

ড্রয়ার থেকে একটা হাভানা চুরুট বের করে টেবিলে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে ঠুকতে ভাবছেন রাহাত খান। ল্যাপ লেজারগুলো কে নিল, কেন নিল, আর কার জন্যে নিল সেটাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। কাঁচা পাকা ভ্রূ জোড়া কুঁচকে ভাবছেন রাহাত খান। সোহানা কথা বলে তাঁর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল না। বুড়োর বিশ্বাস কবির চৌধুরী আছে এর পিছনে। বড় একটা কিছু ঘটাতে যাচ্ছে সে। আলবার্তো ভেরিনোর রিপোর্টে জানা গেছে কমপিউটর প্রসেসিং আর ইলেকট্রিক ওয়েলডিঙের জন্যে দু’জন খুব দক্ষ

লোক চায় সে- অ্যাথলেট টাইপের লোক, মাটি থেকে অনেক উপরে নির্ভয়ে কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে তাদের। দুজন ভাল লোককেই পাঠাচ্ছেন তিনি। রানা আর রূপা।

রিপোর্টে জানা গেছে কী এক দুর্ঘটনার ফলে কবির চৌধুরী এখন চোখে প্রায় দেখে না বললেই চলে।

পুরু লেন্সের চশমা ব্যবহার করে সে। অবশ্য এটাও শোনা যায়, যে দৃষ্টি শক্তির এই অভাব পূরণ করার জন্যে ইতোমধ্যেই একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। মাস ছয়েক আগে বিষাক্ত গ্যাস নিয়ে কাজ করার সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বিষাক্ত গ্যাস লেগে চোখে ছানির মত একটা পর্দা পড়েছে। অপারেশন করলে ভাল হবে তার চোখ- কিন্তু চোখের বিশেষজ্ঞ জানিয়েছে দু'বছরের আগে ওটা পরিপক্ব হবে না। কিন্তু দু'বছর বসে থাকার লোক কবির চৌধুরী নয়। ইতোমধ্যেই সে রাডার আর ফিশ-আই লেন্স-এর সংমিশ্রণে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। এর সাহায্যে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভাল দেখতে পাবে সে। রাডার থাকাতে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চতুর্দিকে যে কোন বস্তুর অবস্থান তার জানা থাকবে। অর্ডার দিয়েছে জাপানে- এখন কেবল 'জাপান অপটিকস' থেকে লেন্সটা আসার অপেক্ষা।

মিউনিখ ব্রিয়ার কেলার থেকে বিখ্যাত ক্যাথিড্রালের সামনে ব্যস্ত স্কোয়ারটাতে এসে দাঁড়াল ডেভিড ফ্রস্ট। ফোর সিজন্স্ হোটেল মিউনিখ্ শহরের প্রায় মাঝামাঝি। ডেভিড আপাতত এই হোটেলেই থাকছে। মিউনিখের কোন জায়গাই ফোর সিজন্স্ হোটেল থেকে খুব একটা দূরে পড়ে না।

স্কোয়ারটা পার হয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা ধরে সব্জি আর

ফলের বাজারে পৌঁছল ডেভিড। সুন্দর করে সাজানো দুটো বড় দোকানের মাঝে চাকাওয়ালা একটা ঠেলা গাড়ির ওপর বাদাম সাজিয়ে বসে আছে এক বুড়ি।

ডেভিডের পরনে চামড়ার জ্যাকেট, অনেকদিনের ব্যবহারে মলিন। গলায় একটা সাদা রুমাল জড়ানো। জ্যাকেটের বাম দিকের পকেটে একটা আমেরিকান লিজিয়নের ব্যাজ ঝুলছে।

'গুটেন মরগেন,' বলল বুড়ি ডেভিডের উদ্দেশে। তীক্ষ্ণ চোখে খেয়াল করছে সে তার গলার রুমাল, ব্যাজ আর মুখ।

'গুড মর্নিং,' ইংরেজীতে জবাব দিল ডেভিড।

'এই ঠাণ্ডার দিনে কিছু গরম চেস্টনাট দেব?' জিজ্ঞেস করল বুড়ি।

'ইয়া বিতে,' জার্মান ভাষাতেই এবার ধন্যবাদ দিয়ে সম্মতি জানাল ডেভিড।

চিমটে দিয়ে কাঠ কয়লার আগুন থেকে বেছে বেছে চেস্টনাট বের করে একটা কাগজের ঠোঙায় ভরল সে, 'খুব গরম কিন্তু- আঙুল পুড়িয়ো না যেন,' সাবধান করল বুড়ি।

একটা বাদামের খোসা ছাড়াতে গিয়ে আঙুলে ছ্যাঁকা খেল ডেভিড। বুড়ি মিছে সাবধান করেনি। তবে চেহারায় টের পেতে দিল না যে সে ছ্যাঁকা খেয়েছে।

'অউফ ভিতেশান,' বিদায় জানাল ডেভিড। চেস্টনাট মুখে পুরল সে- অপূর্ব স্বাদ।

'গুড বাই,' বুড়ি জবাব দিল।

ফিরতি পথে ধীর পায়ে হেঁটে এসে একটা পেভমেন্ট ক্যাফেতে থামল সে। একটা কফির অর্ডার দিয়ে চেস্টনাটগুলো সব ঢালল টেবিলের ওপর ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে। লক্ষ করল প্যাকেটটা রয়েছে

একদম নিচে।

এক হাত দিয়ে আড়াল করে প্যাকেটটা খুলল সে। ফার্স্টক্লাসে প্যারিসে যাওয়ার একটা বিমান টিকেট আর পাঁচ হাজার ইউ এস ডলার পেল সে প্যাকেটে। কোন ব্যাখ্যা নেই- একটা পিপে লেখা, রিপোর্ট টু প্যারিস। নিচে রয়েছে দুটো অক্ষর, কে.সি.। এক কাপ কফি শেষ করে আর এক কাপের অর্ডার দিল ডেভিড।

পাঁচ

রবারের একটা টিউব পরে স্যাতোর অভিজাত তাপ-নিয়ন্ত্রিত সুইমিং পুলে ভাসছে কবির চৌধুরী। নিজে সচেষ্ট না হয়ে এইরকম পানির উপর ভেসে বেড়ানোর একটা বিচিত্র আনন্দ আছে। স্নানের সময়ও চোখে তার মোটা লেন্সের চশমাটা রয়েছে। ওটা ছাড়া বলতে গেলে কিছুই দেখে না কবির চৌধুরী।

বিরাট এলাকা নিয়ে এই স্যাতো। বেশ আয়েশের সাথেই জীবন যাপন করছে এখানে কবির চৌধুরী। স্যাতোর আস্তাবলে তার একটা মিশমিশে কালো স্ট্যালিয়ন রয়েছে। রোজ সকালে ঘোড়া দাবড়ায় সে বিরাট ময়দানে। বিরাট ফুলের বাগান স্যাতোতে- কিন্তু কবির চৌধুরীর ক্ষীণ দৃষ্টি কোনদিনই পড়েনি এমন অনেক বাগানও আছে। বাগান রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মালী আছে বারো চোদ্দজন। স্যাতোর বিরাট প্রাসাদে এমন অনেক

কামরা আছে যেখানে কবির চৌধুরী কোনদিনই পদার্পণ করেনি। কিন্তু সে-সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে লোক আছে আট-দশজন।

দূরে দেখা যাচ্ছে, কে একজন আসছে সুইমিং পুলের দিকে। অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে চেয়ে থেকেও চিনতে পারল না কবির চৌধুরী লোকটা কে। চোখের যন্ত্রটা শীঘ্রি তৈরি করার জোর একটা তাগিদ অনুভব করল সে।

আরও খানিকটা কাছে আসার পর হাঁটার ভঙ্গি দেখে অনুমান করা গেল, লোকটা তার অনুগত দেহরক্ষী ব্যারি হোমস্। অনেক কাছে আসার পর দেখা গেল সত্যই ব্যারি হোমস্ই। সামনাসামনি আসতেই জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী, 'কি খবর, কাজ কতদূর?'

'জ্বী স্যার, হুবহু আপনার নির্দেশ মতই চলছে।' জবাব দিল সে।

'আমার কাছে ব্যর্থতার কোন ক্ষমা নেই। কথাটা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ো।'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি এখনই যাচ্ছি এয়ারপোর্টে নতুন যারা আসছে তাদের রিসিভ করতে। যাব?' ওই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে যে কোন সময়ে সে খালি হাতেই কবির চৌধুরীকে পিষে মারতে পারে- অথচ কবির চৌধুরীর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়ালেই কেন যেন নিজেকে কেঁচোর চেয়েও অধম বলে মনে হয় তার।

'যাও,' অনুমতি দিল চৌধুরী। আবার সাবধান করে দিল, 'নির্দেশ মত সব কাজ করা চাই।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার। ওরা যখন এখানে পৌঁছবে ওদের কারোই ধারণা থাকবে না তারা কোথায় কতদূরে আছে, বা আজ কি বার।'

‘খুব ভাল কথা। নিখুঁত কাজই আমার পছন্দ।’ বলেই চিৎ সাঁতার কেটে পুলের অন্য পারের দিকে রওনা হলো কবির চৌধুরী।

মেঘগুলো দ্রুত ছুটে চলে যাচ্ছে পিছনের দিকে। কংকর্ডের ঠিক জানালার ধারের সীটে বসেছে সোহানা। চালর্স দ্য গল এয়ারপোর্ট দেখা যাচ্ছে নিচে। সেন্ট্রাল প্যারিস থেকে প্রায় বারো মাইল উত্তর-পুবে এয়ারপোর্টটা।

একজন স্টুয়ার্ডেস খালি গ্লাস আর কাপ সংগ্রহ করছে। আর একজন ছুটে এল- হাতে একটা কাগজ, চোখে মুখে সম্ভমের ছাপ। একজন হোমরাচোমরা কারও সাথে কথা বলছে সেটা সে উপলব্ধি করছে, ‘স্যার, এই মেসেজটা এইমাত্র এলিসি প্যালেস থেকে এসেছে আপনার জন্যে।’ এলিসি প্যালেস থেকে রেডিওতে কারও কাছে মেসেজ আসার অর্থ স্টুয়ার্ডেসকে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার পড়ে না।

‘আমরা অল্পক্ষণের মধ্যেই চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি, স্যার। আপনার বেল্টটা একটু বেঁধে দিয়ে যাই।’ একটু অতিরিক্ত সৌজন্য দেখানোর যেন চেষ্টা করল স্টুয়ার্ডেস।

‘ওটা সময়মত আমিই বেঁধে নিতে পারব। ধন্যবাদ।’ মেসেজটা হাতে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন রাহাত খান।

কংকর্ডটা আলতোভাবে রানওয়ে ছুঁয়ে দৌড়াচ্ছে। মাটি ছুঁই ছুঁই করছে ওটার লম্বা নিচের দিকে নামানো ছুঁচোল নাক।

সোহানাকে নিয়ে এক নম্বর ভি আই পি টার্মিনালের দিকে এগুলেন রাহাত খান। আশেপাশে সব পপ গায়ক, চিত্র তারকা আর বিজনেস এক্সিকিউটিভদের ভিড়। প্যারিস ফ্লাইটের এরাই

স্বাভাবিক যাত্রী।

গ্লাস টিউবের মধ্যে ট্রাভেলেটরে করে সামনে এগুচ্ছেন রাহাত খান। পরপর তিনটে লেভেল পার হতে হবে তাঁদের। ট্রান্সফার লেভেলে এসে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে চাইলেন রাহাত খান- যারা আসছে যাচ্ছে তাদের সবাইকে এখান দিয়েই যেতে হবে। চেনা মুখ চোখে পড়ল না একটাও।

পাসপোর্ট আর কাস্টমস কন্ট্রোল পেরিয়ে দ্বিতীয় ট্রাভেলেটরে চড়ে অ্যারাইভাল লেভেল- তিনটে ভাগ আবার, ব্যাগেজ হল, তারপর আবার কাস্টমস কন্ট্রোল, এরপরই বাইরের গ্যালারি হয়ে কোচ-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড।

নিজেদের সুটকেস আর ব্যাগেজ হল থেকে সংগ্রহ করে দু'জনে এখন অপেক্ষা করছে বাইরের গ্যালারিতে। আজকে এই এয়ারপোর্টে বেশ কিছু ঘটনা ঘটবে- সে সব প্রত্যক্ষ করাই উদ্দেশ্য।

দু'জন রাহাত খানেরই নিজের লোক। রানা আর রূপা। কিন্তু ল্যাপ লেজারের হাইজ্যাকারও আজ আসবে বলে গোপন খবর এসেছে। তাকে চিনে বের করার আগ্রহটা পুরোপুরি রয়েছে রাহাত খানের মনে। পুরো ব্যাপারটা ঘটছে ওই একটা লোককে কেন্দ্র করে।

প্যান-অ্যামের বোয়িং ৭৪৭ নামল কংকর্ডের পরপরই। রানা এগিয়ে আসছে ট্র্যান্সফার লেভেলের দিকে। লেভেল দুই-এ বসে রানাকে চিনে নিতে কোনই কষ্ট হলো না রাহাত খানের। চট করে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকালেন তিনি।

আধঘণ্টা পর মিউনিখ ফ্লাইট এসে পৌঁছল। সামান্য দেরি হয়েছে কি একটা গোলযোগের কারণে।

ব্যাগেজ হলের একটা পিলারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড ফ্রস্ট। নিজের সুটকেসটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সে অনেক সুটকেসের মাঝে। কনভেয়র বেল্টে একের পর এক সুটকেস এগিয়ে আসছে। নিজের সুটকেসটা চিনতে পেরেই চট করে সেটাকে নামিয়ে নিল সে। ঠিক এই সময়ে এয়ারপোর্টের মাইকে ভেসে এল, 'মিস্টার ফ্রস্ট- মিস্টার ডেভিড ফ্রস্ট- প্যাসেঞ্জার ফ্রম মিউনিখ- কাইন্ডলি রিপোর্ট টু দ্য লস্ট লাগেজ অফিস অভ লেভেল ওয়ান।'

কাস্টমসের একটা লোকের কাছ থেকে এক নম্বর লেভেলে পৌঁছানোর পথ জেনে নিল ডেভিড। লস্ট লাগেজ অফিসের সামনে একটা লাইন- লাইনে দাঁড়াল সে। তার টার্ন আসতেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল তাকে আসতে বলা হয়েছে এখানে। একটা ছোট্ট পকেট রেডিও বের করে মেয়েটা কাউন্টারের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি আপনার?'

পরীক্ষা করে দেখল ডেভিড রেডিওটা। জীবনে কখনও দেখেনি আগে। তবে যে খেলায় সে নেমেছে এখানে সবই প্ল্যান মাফিক চলে, হঠাৎ করে কিছু ঘটে না। চট করে বলল, 'তাই তো! কোথায় পাওয়া গেল?'

'প্লেনেই ফেলে এসেছিলেন আপনি ভুল করে।' হেসে জবাব দিল মেয়েটা। 'স্টুয়ার্ডেস আপনার নাম জানত- আপনাকে ওই রেডিও সহ দেখেছে বলে সে এটা জমা দিয়ে গেছে এখানে।'

'যাহোক, আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেবেন তাকে।'

'সে আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি। খুশির কথা এই যে আপনার জিনিসটা খোয়া যায়নি।' বিনীত ভাবে বলল মেয়েটা।

রূপাকে ধরে ফেলল স্টুয়ার্ডেস ট্রাভেলেটরের উপর। 'রোমের

প্লেন থেকে নামবার সময়ে এটা আপনার ব্যাগ থেকে পড়ে যায়, মিস মনরো।’ ছুটতে ছুটতে এসেছে মেয়েটা- এখনও হাঁপাচ্ছে।

‘ধন্যবাদ,’ হাত বাড়িয়ে রেডিওটা নিল রূপা, ‘এই রকম বোকার মত অনেক কিছুই হারিয়েছি আমি। অসংখ্য ধন্যবাদ।’

স্প্যাসেঞ্জারদের সেবাই আমাদের কাজ।’ বিনয়ের সাথে হেসে বলল স্টুয়ার্ডেস। চলে গেল দ্রুত পায়ে।

কোনখান থেকে কোন খবর না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। ইনফরমেশন ডেস্কে গিয়ে নিজেকে পিটার উড্‌কক বলে পরিচয় দিল, জিজ্ঞেস করল তার জন্যে কি কোন খবর আছে?

‘না, স্যার, কোন মেসেজ নেই- তবে এটা আপনার সংগ্রহ করার কথা। আপনার জন্যে এই ট্র্যানজিস্টারটা রেখে গেছেন এক ভদ্রলোক।’

‘সত্যি, এটার কথা একেবারে ভুলেই গেছিলাম।’ কপট বিস্ময় প্রকাশ করল রানা, ‘ধন্যবাদ।’

প্রতি পনেরো সেকেন্ড অন্তর সোনিক সঙ্কেত আসছে। রেডিও অন করতেই শোনা গেল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ‘তোমরা সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা জানাও।’

‘লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার,’ জবাব দিল রানা।

রূপার কাছ থেকে ছোট্ট জবাব গেল, স্পাচ্ছি।’

ফ্রস্ট বলল, ‘রজার।’

প্রত্যেকটাই টু-ওয়ে সেট।

‘তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও।’ আবার শোনা গেল ব্যারির গলা। ‘রোম থেকে যে এসেছে সে ট্রাভেলেটরে চড়বে লেভেল ওয়ানে। নিউ ইয়র্ক থেকে আগত প্যাসেঞ্জার ট্রাভেলেটরে চড়বে লেভেল টু-তে। আর মিউনিখ থেকে

যে এসেছে সে চড়বে লেভেল থ্রীতে। প্রত্যেকেই তোমরা ট্রাভেলেটরের শেষ মাথায় পৌঁছে উল্টো দিকের ট্রাভেলেটরে চড়বে যতক্ষণ আমি আবার নির্দেশ না দিই।'

'মেসেজ আন্ডারস্টুড,' জবাব দিল রূপা। মিউনিখ? মিউনিখ থেকে আবার কে এল? অবাক হয়ে ভাবল রূপা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা তিনজন। রানার মাথায় দ্রুত খেলে গেল চিন্তাটা।

নিরাপত্তার জন্যেই সোহানাকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গ্রাউন্ড লেভেলে একটা সোফায় বসে জিরোচ্ছেন রাহাত খান। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। যে কেউ তাঁকে দেখলে ভাববে একজন ক্লান্ত যাত্রী। চমকে উঠলেন রাহাত খান- ও কি? রেডিও না? রূপা তার কানের সাথে রেডিওটা ধরে এগুচ্ছে! মনে মনে আঙুল কামড়ালেন রাহাত খান। রিমোট কন্ট্রোলে কাজ করছে ওরা। তিনি যেখানে বসেছেন সেখান থেকে রানা এবং রূপা দু'জনের উপরই নজর রাখতে পারছেন। গ্লাস টিউবের ভিতর দিয়ে সব কিছুই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তীক্ষ্ণ নজরে তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ করতে লাগলেন রাহাত খান। তারও কানে রেডিও থাকবে এটা নিশ্চিত। ট্রাভেলেটরে অনেক লোক। কিন্তু অনেক খুঁজেও তৃতীয় ব্যক্তির সন্ধান মিলল না।

রেডিওতে আবার ব্যারির গলা শোনা গেল। 'যিনি তোমাদের এই কাজে নিযুক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্য শোনো এবার।'

টেলিফোন বুদের ভিতর থেকে ব্যারি নির্দেশ দিচ্ছে। সোহানা তার খুব কাছেই দাঁড়ানো। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে টের পেল না, তার এত কাছ থেকেই এত সব কাণ্ড ঘটছে। টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন করে দিল ব্যারি।

সিগারেট লাইটার বের করে রেডিওর সাথে লাগাল রানা, লক্ষ করলেন রাহাত খান। যাক- কিছু খবর অন্তত পাওয়া যাবে- ভাবলেন তিনি।

'তোমাদের প্যারিস আগমন সফল হোক এই কামনা করেই স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের।' টেপ করা ক্যাসেট থেকে স্পষ্ট উচ্চারণে কবির চৌধুরীর গুরু গম্ভীর গলা ভেসে এল। 'আমার নাম কবির চৌধুরী। আমি এখন তোমাদেরকে আমার শর্তাবলী জানাচ্ছি- ইচ্ছে করলে তোমরা আমার সাথে কাজ করতে পারো অথবা আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারো। যদি কোন কারণে আমার প্রস্তাবে অসম্মত হও তবে তোমরা যে যেখান থেকে এসেছ সেখানকার একটা রিটার্ন টিকেট পাবে গ্রাউন্ড লেভেলের 'রিজার্ভ' সেকশনে। যদি কেউ ফিরে যেতে চাও তোমাদের কারও বিরুদ্ধেই কোন বিরূপ পদক্ষেপ নেয়া হবে না- তবে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তাহলে তোমরা আমার সাথে কাজ করার সুযোগ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে। সারা দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন অরগানাইজেশন আমি চালাই। তাদের কোনটাতেই আর তোমাদের কোনদিন নেয়া হবে না।'

এতদিন পরে আবার কবির চৌধুরীর গলা শুনে একটু বিচলিত বোধ করছে রানা- ওই নামটার সাথে তার অনেক দিনের পরিচয়। কি রকম সাংঘাতিক একগুঁয়ে আর নিষ্ঠুর হতে পারে লোকটা, সেটা তার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।

রাহাত খান এখনও খুঁজছেন তৃতীয় ব্যক্তিকে। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কারণ জাতীয় পোশাক (আলখেল্লা) পরা বিশালাকার আফ্রিকানটার আড়ালে রয়েছে সে।

'আমার হয়ে কাজ করতে যদি তোমরা রাজি থাকো তাহলে

এই মুহূর্ত থেকেই আমার অথবা আমার নিয়োজিত লোকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে তোমাদের। কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা চরম ভাবে দণ্ডনীয় হবে। আমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতার একই শাস্তি- মৃত্যু। আমি চাই না যে এই অপারেশনে তোমাদের কারও কোন ক্ষতি হোক- তবে এটা তোমাদের জানিয়ে রাখা কর্তব্য মনে করছি তোমাদের যে কারও প্রতি হত্যা করার নির্দেশ আসতে পারে। যদিও মনে করি না তার দরকার পড়বে- তবু কথাটা জানিয়ে রাখা ভাল। আমার এই শর্তগুলো মেনে নিয়ে কাজ করলে বিনিময়ে তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক মিলিয়ন ডলার দেব। আমাদের এই মিশন সফল হোক বা বিফল হোক- টাকাটা তোমরা পাবে। দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি তোমাদের মনস্থির করার।'

রানা আর রূপার তো প্রশ্নই ওঠে না- রাহাত খান পাঠিয়েছেন ওদের। ডেভিড ফ্রস্টের রাজি হওয়ার কারণটা বোঝা মুশকিল, হয়তো টাকার লোভনীয় অঙ্ক শুনেই রাজি হয়ে গেল সে, সম্মতি জানাতে দ্বিধা করল না।

সবাই রাজি শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ব্যারি। এবার পরবর্তী আরও কতগুলো নির্দেশ দিল সে রেডিওতে।

রানা ও রূপা দু'জনকেই এক ট্রাভেলেটরে চড়ে গ্রাউন্ড লেভেলের দিকে আসতে দেখে রাহাত খান সঠিক ভাবেই অনুমান করলেন যে রেডিও ইন্সট্রাকশন শেষ হয়েছে। সোহানাকে ইশারা করে হলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

সোহানা দ্রুত এগিয়ে এসে ধাক্কা খেল রানার সাথে। মাত্র সুন্দর দামী একটা লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল রানা- ধাক্কা খেয়ে হাত থেকে লাইটারটা ফস্কে নিচে পড়ল। কুণ্ঠিত সোহানা দুঃখ প্রকাশ করে লাইটারটা তুলে রানার হাতে দিল।

রাহাত খানের কাছে এসে দাঁড়াতেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বদলাতে পেরেছ?' মুচকি হেসে মাথা হেলিয়ে জানাল সোহানা, পেরেছে।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন রাহাত খান। তারপরই ঝট করে ঘুরে গেলেন- ধাক্কা লাগল সোহানার সাথে, আর একটু হলেই ছিটকে পড়ত। 'কি ব্যাপার, কি হলো?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সোহানা।

'লোকটা এক্সিটের দিকে এগুচ্ছে- লম্বা, বাদামী চুল। হ্যাট নেই, চামড়ার জ্যাকেট আর নীল জিন্‌স্‌ পরা, দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সোহানা, 'রেডিও কাঁধে ওই লোকটা তো?'

'রেডিও, ফ্যান্টাস্টিক! এই লোকই তাহলে ল্যাপ লেজার ছিনতাইকারী।'

'এই লোকই কি সেই তৃতীয় ব্যক্তি?'

'হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে। কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের। আমার আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল। ওর নাম কেন যে আমার ফাইলে নেই সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। ওর নাম ডেভিড ফ্রস্ট। এক্স সি আই এ অপারেটার।'

'এক্স?' প্রশ্ন করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান, 'হ্যাঁ, বছর তিনেক আগে ওর একবার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়। সেই থেকেই সি আই এ ছেড়ে দিয়েছে লোকটা।'

'ভাল এজেন্ট ছিল?'

'দি বেস্ট।' জবাব দিলেন রাহাত খান। 'আই মীন ওয়ান অভ দি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে ওর চেয়ে বেশি খুব কম লোকেই

জানে। লেজারের নাড়ি নক্ষত্র ওর নখদর্পণে। ওর নাম আমার লিস্টে না আসার একটাই কারণ হতে পারে, সেটা হচ্ছে ইউনাকোতে ওর নিজস্ব লোক আছে।'

এক কার্টন সিনিয়র সার্ভিস কেনার ছলে একটা স্টলে দেরি করে অনুসরণ করাটা আরও সহজ করে দিল রানা। এবার হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল সে। মিউনিখ থেকে কে এল জানতে হবে তার। কি কারণে এই লোককে আনা হয়েছে- কি তার বিশেষত্ব সেটা রানা বা রূপা কারোই জানা নেই।

রানা আগেও এখান থেকে হেলিকপ্টার ভাড়া নিয়েছে অনেকবার। তাই গন্তব্যস্থান তার কাছে খুবই পরিচিত। রূপার মিনিট খানেক আগে পৌঁছল রানা হেলিপ্যাডে। ব্যারির দেখা পেল রানা ওখানেই। রূপা পৌঁছতেই ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল ব্যারি পিটার উডককের। এটাও জানাতে ভুলল না যে এতক্ষণ তার নির্দেশই শুনেছে সবাই রেডিওতে।

বিনীত ভাবে রূপার সাথে হাত মেলাল রানা- যেন প্রথম পরিচয়। 'আমার সৌভাগ্য, মিস মনরো, যে এমন সুন্দরী এক মহিলাকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি।' এমন ভাবে বলল মনে হলো কথায় কোন খাদ নেই। ব্যারির সাথে হেলিকপ্টারে উঠল ওরা দু'জনেই।

রাহাত খান কারগো হ্যাঙ্গারের পাশ থেকে পুরো ব্যাপারটাই লক্ষ করছেন, পাশে সোহানা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাহাত খান বললেন, 'কবির চৌধুরী টেক্কা মেরে গেল এবার আমাদের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে হেলিকপ্টার নিয়ে।'

'কিন্তু আপনার তো রেড্ প্রায়োরিটি আছে- ক্ষমতা খাটালে

হয় না?'

'ভাল কথা- কিন্তু তাতে সময় লাগবে যথেষ্ট। ওরা তো এক্ষুণি রওনা হবে। অবশ্য ফ্লাইট প্ল্যান জোগাড় করা যায়- কিন্তু ফ্লাইট প্ল্যান অনুযায়ী ওরা ফ্লাই করবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'আমরা কি করব এখন?' অসহায় প্রশ্ন করল সোহানা।

'কিছুই করার নেই আমাদের এই মুহূর্তে। রূপা-রানা দু'জনেই ভাল এজেন্ট- যা করণীয় ওদেরই করতে হবে সব।'

সোহানা দেখল ডেভিড ফ্রস্ট একজন বিমান কর্মচারীর সাহায্য নিয়ে ঠিকই জায়গা মত পৌঁছে গেছে। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে গেল। সবাই ভিতরে ঢুকতেই রোটর ব্লেড ঘুরতে আরম্ভ করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। রূপা আর রানা এখন সম্পূর্ণ একা।

হেলিকপ্টারে উঠে ছয়জন অপরিচিত মানুষের সম্মুখীন হলো ডেভিড। প্রথম নজরে এদের কাউকে সে আগে দেখেছে বলে মনে হলো না তার। একজন সাদা অ্যাপ্রন পরা ডাক্তার, গলায় স্টেথোসকোপ ঝুলছে। চারজন স্ট্রেচারে শোয়া। বাকি দাঁড়ানো লোকটা নিশ্চয়ই চার্জে রয়েছে- বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না। ডেভিড তার দিকে চেয়ে নড করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ডেভিড ফ্রস্ট।'

নিজের নাম বলে তার সাথে হাত মেলাল ব্যারি।

স্ট্রেচারের উপর রূপা ঝট করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। চেহারা দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল। নাম শুনে এবার নিশ্চিত হলো। রূপা ভাল করেই চেনে ওকে। ওর দক্ষতা কোন্ লাইনে তা রূপার অজানা নয়।

'অন্যদের সাথে পরে পরিচয় করিয়ে দেব।' ব্যারি বলল

ডেভিডকে।

ডেভিড লক্ষ করল স্ট্রেচারে শোয়া সহকর্মীদের মাঝে একজন মেয়েলী চেহারার ইন্দোনেশিয়ান, ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের মত দেখতে একটা মেয়ে, তৃতীয় ব্যক্তি একজন পেশীবহুল চওড়া কাঁধ বিশিষ্ট শক্ত সমর্থ পুরুষ। আর চতুর্থজন একজন এশীয়। গালকাটা ব্যারি নিশ্চিত ভাবে ফ্রেঞ্চ। তার জন্যে নির্ধারিত বাঙ্কটা দেখিয়ে দিতেই নির্দ্বিধায় সেখানে টানটান হয়ে শুয়ে চোখ বুজল ডেভিড। চোখ বুজল ঘুম পেয়েছে বলে নয়- আর সবাই চোখ বুজে আছে, তাই। কিন্তু একটু পরেই একটা বাজে ধরনের চাপা হিস হিস শব্দে চোখ খুলল সে। দেখল ডাক্তার একজনের উপর ঝুঁকে পড়ে এনেসথেটিক দিচ্ছে। এটা কবির চৌধুরীর একটা বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তার টার্ন আসতে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল সে এই ব্যবস্থা। অচেতন অবস্থায় ডাক্তারের মুখের দুর্গন্ধ সহ্য করা অনেক সহজ হবে।

সোহানাকে নিয়ে মেজর জেনারেল (অভ) রাহাত খান নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার সাথে রানার সিগারেট লাইটারের মাইক্রো টেপটা বাজিয়ে শুনলেন। ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট যে লিমুজিনটা তাঁর ব্যবহারের জন্যে দিয়েছে সেটারই স্টেরিও সিসটেমে প্লাগ করে শোনা গেল টেপটা। দশ লক্ষ ডলার করে প্রত্যেককে দেয়া হবে- কাজ হোক বা না হোক। কথাটা শুনে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল সোহানা। নিশ্চয়ই একটা বড় দাঁও মারার তালে আছে কবির চৌধুরী।

গাড়ির রেডিও টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভার তুলে নিল সোহানা।

সোহানা নিবিষ্ট মনে টেলিফোনে কথা বলছে আর নোট

নিচ্ছে। কথা শেষ হতেই প্যাডের উপরকার নোট করা কাগজটা রাহাত খানের দিকে এগিয়ে দিল।

কাগজটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়লেন রাহাত খান।

‘একই লোক।’ সোহানা অন্যমনস্ক ভাবে প্যাডের ওপর টোকা দিতে দিতে বলল। ‘নার্ভাস ব্রেকডাউনের পরে ১৪ জানুয়ারি ১৯৭৮ সনে চাকরি থেকে বরখাস্ত হয় তার ভারসাম্যহীন আচরণের জন্যে। এটাই মনে করার চেষ্টা করছিলেন এতক্ষণ?’

‘হ্যাঁ, আমারও এইমাত্র মনে পড়েছে।’ চোখ বুজে গাড়ির নরম গদিতে হেলান দিয়ে বসলেন রাহাত খান। টিনটেড্ গ্লাসের লিমোজিন ছুটে চলল হোটেল রিজ-এর দিকে।

‘ডেভিড ছিল সি আই এর সবচেয়ে দক্ষ অস্ত্র বিশারদ। আমাদের দুর্ভাগ্য- নাকি কবির চৌধুরীর কপাল, ডেভিড যে কোর্সে ট্রেনার ছিল সেই ট্রেনিঙের জন্যে রূপাকে পাঠানো হয়েছিল বছর চারেক আগে।’ সারাটা পথ আর কোন কথা বললেন না রাহাত খান। কি যেন ভাবছেন তিনি- মুখটা গাম্ভীর্যের ভারে থমথম করছে। হাতে ধরা জ্বলন্ত চুরুটটাও টানতে ভুলে গেছেন- নিভে গেছে ওটা। না জেনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন তিনি রূপাকে। সম্ভবত রানাকেও; কারণ রূপার বিপদে চুপ করে বসে থাকবে না রানা।

ছয়

ডাক্তারের ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রূপার অসাড় দেহটা দেখছে ব্যারি। ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার তার চোখের পাপড়ি ধরে টেনে চোখ খুলল। ডাগর কালো চোখের মণি দেখা গেল। এখন অস্বাভাবিক রকম স্ফীত।

'মেয়েটা সুস্থ তো?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল ব্যারি।

'অবশ্যই।' খেঁকিয়ে উঠল ডাক্তার, 'ভাল না থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি?'

'মানে…' আরম্ভ করেছিল ব্যারি কিন্তু অ্যানেসথেশিয়ার ওপর ডাক্তারের ছোটখাট একটা লেকচার শুনে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করল।

'না, আমি আপনার খুঁত ধরতে যাচ্ছি না- তবে, কবির চৌধুরীর নির্দেশ- মানে…আপনি তো জানেনই।'

'খুব জানি।' গর্বের সাথে বলল ডাক্তার। 'তোমার মনে রাখা উচিত যে আমি এখানকার মেডিক্যাল ইনচার্জ। এরা সবাই আমার তত্ত্বাবধানে আছে। আমি চাই না কোন নির্বোধ অবুঝ এখানে নাক গলাক। তুমি যদি চাও আমি কবির চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করি তুমি আমার কাজে সাহায্য করার চেয়ে বাধারই সৃষ্টি করেছ বেশি,

অন্তরায়ই হয়েছ, তাহলে...' কথা শেষ করতে পারল না ডাক্তার।

'না, না।' আঁতকে উঠল ব্যারি। 'আপনিই এখানে সর্বেসর্বা- আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছিলাম সবকিছু ঠিক আছে, কোন গোলমাল বাধেনি।'

'গোলযোগ?' খেপে উঠল ডাক্তার, 'এই মেয়ের নাড়ি, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস সবই চমৎকার ভাবে কাজ করছে। আমার ধারণা তোমার চেয়েও সক্ষম আর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এই মেয়ে- আর তুমি বলছ কিনা গোলযোগ? পথ ছাড়ো, অযথা সময় নষ্ট কোরো না আমার। অন্যান্য সবাইকে এখনও পরীক্ষা করা বাকি রয়েছে।'

সরে দাঁড়াল ব্যারি। ডাক্তারকে ছেড়ে পাইলটের কেবিনের দিকে এগুলো। জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হেমন্তের এই সুন্দর সকালও ব্যারির মনে কোন আনন্দের সঞ্চার করতে পারল না। সূর্যটা পিছন দিকে। সবুজ মাঠে সামনের দিকে হেলিকপ্টারের ছায়াটা পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন নিজের ছায়াকেই দাবড়ে নিয়ে চলেছে হেলিকপ্টারটা। এক ঘণ্টা হলো ওরা প্যারিস ছেড়েছে। পাক্কা শহুরে মানুষ ব্যারি- ওর মনটা এরই মধ্যে ছটফটিয়ে উঠছে শহুরে জীবনের জন্যে। গ্রাম, খালি মাঠ আর এখানকার বাসিন্দাদের কাউকেই কেন জানি ও বিশ্বাস করতে পারে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চেয়ে রয়েছে ব্যারি। দেখল, দূরে স্যাতোটা ধীরে ধীরে আকারে বড় হচ্ছে।

পাইলট দেখতে পারে না ব্যারিকে। মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'এখানে কি চাও? নিজের কাজ করো ওদিকে গিয়ে।'

মুখ ব্যাজার করে ফিরে এল ব্যারি প্রধান কেবিনে।

চারজনই সম্পূর্ণ অচেতন- কারও গায়ে এক চিলতে কাপড় নেই। একবার দেহ পরীক্ষা করছে আবার ফাইল নিয়ে কি যেন সব মিলিয়ে দেখছে ডাক্তার নিবিষ্ট মনে।

'ওরা সবাই পরিষ্কার তো, ডাক্তার?' বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করল সে।

হাসল ডাক্তার ওর বলার ভঙ্গিতে। 'আপাতদৃষ্টিতে ওদের কারও কোন রোগ আমার পরীক্ষায় ধরা পড়েনি। ওরা কেউ ড্রাগ অ্যাডিক্ট না এবং সবাই আজ স্নান করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি জানতে চাইছ ওদের কারও কাছে লুকানো কোন অস্ত্র আছে কি নেই- তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন।' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি উপহার দিল সে ডাক্তারকে।

'না, নেই।' উত্তর দিয়ে বাধিত করল ডাক্তার।

হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে স্যাতো দেখা যাচ্ছে- এখন আরও কাছে, আরও বড় দেখাচ্ছে। এটা লয়ার উপত্যকার তিরিশটা স্যাতোর মধ্যে একটা। পাঁচশো বছরেরও বেশি বয়স। হয়তো এখানে শ্যামবোর্ডের ব্লোয়িস ট্রায়োর মত ইন্দ্রজাল নেই, কিন্তু কবির চৌধুরীর এই স্যাতোটা নিরিবিলি। অদ্ভুত একটা নিশ্চিন্ত স্বস্তি আছে এখানে। আর আছে বিভিন্ন আর্ট কালেকশন। সম্ভবত বাকি সব কয়টা স্যাতোর আর্ট কালেকশন একত্র করলেও এই স্যাতোর সমান হবে না। শান্তিতে জীবন কাটানোর জন্যে সত্যিই এটা একটা চমৎকার জায়গা।

ছাতের উপরে একটা ব্রোঞ্জের ঈগল শোভা পাচ্ছে অনেকগুলো চূড়ার ছুঁচাল মাথা ছাড়িয়ে। লম্বা লম্বা চিমনিও রয়েছে বেশ কয়েকটা। আইভি লতা উপরে উঠে গেছে বিশাল চওড়া রাজকীয়

জানালাগুলোর পাশ দিয়ে। ঠিক মাঝামাঝি চওড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দার দিকে। সিঁড়ির দুই ধারে অপূর্ব সুন্দর সব মূর্তি সাজানো রয়েছে সার বেঁধে, সামনের বিরাট খোলা জায়গা থেকে আরম্ভ করে সদর দরজা পর্যন্ত। প্রত্যেকটা ধাপেও দুধারে দুটো করে মূর্তি।

সামনেই চমৎকার সাজানো বাগান- প্রথমে ফুলের বাগান। তার পরে ইটালিয়ান বাগান, সব্জি বাগান, ভেষজ লতাপাতার বাগান। কয়েকটা ঝরণা ছড়িয়ে আছে এদিক সেদিক। প্রত্যেক ঝরণাতেই সাদা মার্বেলের মূর্তি।

'ওদের জাগাবার ব্যবস্থা করুন, ডাক্তার- আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।' মন্তব্য করল ব্যারি। ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ নিয়ে।

দশ মিনিট পরে সুন্দর পার্কটায় নামল হেলিকপ্টার। কবির চৌধুরীর প্রাসাদের ঠিক সামনেই।

ইতোমধ্যেই ডাক্তারের পরিচর্যায় কবির চৌধুরীর এখানে নবাগতদের সবারই জ্ঞান ফিরেছে। রোটর ব্লেড থামার অপেক্ষা করছে অভ্যর্থনাকারী। ওটা থামতেই দরজা খুলে উপরে উঠে এল সে। 'স্যাতো ক্লরিনটের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার নাম রবার্ট গোমেস- আমি মশিয়ে কবির চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী। আশা করি ট্রিপে কোন অসুবিধে হয়নি আপনাদের। কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

'হ্যাঁ, আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বলে উঠল ডেভিড ফ্রস্ট। হাতের আঙুলটা ঘষল সে জানালার কাঁচে। একটা তেলতেলে দাগ পড়ল সেখানে। 'আমার অজ্ঞাতসারে কেন আমার হাতের ছাপ নেয়া হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

‘শুধু আপনার নয়, সবারই হাতের ছাপ নেয়া হয়েছে। আমাদের চেক করে দেখতে হয় ফাইলের সঙ্গে। তবেই না আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব? জানব যে হ্যাঁ, আমরা বন্ধু-বান্ধবের মাঝেই আছি- কি বলেন?’ বক্তব্য শেষ করল রবার্ট।

ব্যাখ্যা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলো যেন ডেভিড। রূপার দিকে চেয়ে একটু হাসল সে। রূপাও প্রতিউত্তরে হাসল- কিন্তু ভিতরটা তার কুঁকড়ে রয়েছে এক অজানা আশঙ্কায়- যদি চিনে ফেলে তবেই সর্বনাশ।

ডেভিডের ভাবে ভঙ্গিতে বা তার কথায় এমন কোন ইঙ্গিত প্রকাশ পায়নি যে রূপা তার পূর্ব-পরিচিতা। সে কি উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে? মানে সরাসরি ধরিয়ে দেবে কবির চৌধুরীর কাছে? নাকি সত্যি সত্যিই সে চিনতে পারেনি রূপাকে? কিন্তু ও তো দেখা মাত্র ডেভিডকে চিনেছে? নিজের রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন সে- কোন মিথ্যা বিভ্রান্তিও নেই। রূপা বেশ ভালভাবেই জানে ডেভিডের মত লোকের পক্ষে তাকে লক্ষ না করা বা ভুলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু হাসি দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সহজ সরল স্বাভাবিক হাসি। অপরিচিতা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাতে চাইলে পুরুষ মানুষ যে রকম হাসে- ডেভিডের চোখেমুখে ঠিক সেই রকমই হাসি।

‘এসো ভিতরে যাওয়া যাক।’ নিচে নামল রবার্ট গোমেস।

রানা ছিল দরজার সবচেয়ে কাছে। সে-ই প্রথম লাফিয়ে নেমে হাত বাড়িয়ে রূপাকে নামতে সাহায্য করল।

‘বাহ্, ভদ্রতাও জানে দেখছি!’ অবজ্ঞাভরে টিপপনি কাটল ডেভিড।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। দুজনেই ঠাণ্ডা চোখে দুজনকে মেপে নিল কিছুক্ষণ। দেঁতো হাসি হেসে ডেভিড বলল, 'তুমি কি ওখান থেকে সরবে? নাকি আমাকেও নামাতে চাও অমন কোলে করে?'

একটু রুষ্ট হয়েই সরে গেল রানা। ডেভিডকে ধমক দিল রবার্ট, 'আরও সংযত হয়ে কথা বলবেন ভবিষ্যতে- কবির চৌধুরী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি পছন্দ করেন না। এতে কাজের ক্ষতি হয়। এখানে কদর কাজের লোকের। একবার কাজ আরম্ভ হলে তা শেষ না করে কবির চৌধুরীর প্রজেক্ট ছেড়ে কেউ যেতে পারে না।'

'তাই নাকি? ভারি ইন্টারেস্টিং তো! সে যাক, সাবধান করে দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল রবার্ট। কিন্তু স্যাতোর সদর দরজার দিকে না গিয়ে প্রাসাদের পিছনে নিয়ে গেল সে। কিচেন গার্ডেনের পাশের স্টেবল ইয়ার্ডে পৌঁছল ওরা। ডজন খানেক লোক বসে আছে একজন ইনস্ট্রাক্টরকে ঘিরে। মাঠের অন্য প্রান্তের দেয়ালে দেখা গেল চারটে ছুটন্ত আকৃতি আঁকা। হাত তুলে সবাইকে দাঁড়াতে বলল রবার্ট। ইনস্ট্রাক্টর তেপায়ার ওপর বসানো ভারী মেশিনগানটা ঘুরিয়ে টারগেটের দিকে ফেরাল। রবার্ট চেঁচিয়ে কি নির্দেশ দিতেই আকৃতিগুলো সচল হলো- প্রথমে নামতে নামতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল, হঠাৎ করে লাফিয়ে বেরিয়ে এল আবার, বাউলী কেটে ডাইনে বাঁয়ে সরে যাচ্ছে সবাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে।

যেন কিছুই না এমন একটা ভাব। বেশি গুলিও খরচ করল না। মাত্র কয়েকটা ছোট ছোট বার্স্টে মেশিনগানধারী আকৃতিগুলোকে একটা একটা করে কচু কাটা করে ফেলল। দেখেই বুঝল সবাই, একটা গুলিও বৃথা যায়নি। এবার সে একটা

ডামির ওপর গুলি ছুঁড়বে। কাঠের ডামি, মাটিতে শোয়ানো কম্যানডো ক্রল করছে যেন। গুলির শুরুতে মাথাটা গেল সবার আগে। তারপর একটা হাত। এবার পরিষ্কার মাঝামাঝি থেকে দুই ভাগে বিভক্ত হলো ডামিটা। হাঁটুর কাছ থেকে পা দুটোকে আলাদা করা হলো সব শেষে।

'মিস্টার চৌধুরীর সাথে কি আমাদের এখনই দেখা হবে?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

'না, আসলে আজকে দেখাই হবে না তাঁর সাথে,' রবার্ট জানাল, 'তবে আগামীকাল সকালে তিনি সবার সাথে কথা বলবেন।'

আস্তাবলের পাশ দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের অস্ত্র-শস্ত্র গোলাবারুদ রাখার মস্ত লম্বা একটা ঘরে। সবার লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানেই।

'লাঞ্চের পরে সবাইকে যার যার কামরা দেখিয়ে দেব। একটু বিশ্রাম নেয়া হলে স্যাতোটা একটু ঘুরে দেখে আমরা যাব ট্রেনিং গ্রাউন্ডে। হ্যাঁ, একটা কথা জানিয়ে রাখছি কোন অবস্থাতেই কেউ বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে না। এখানকার টেলিফোন তোমাদের ব্যবহারের জন্যে নয়। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টাকেই বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে- আর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কি তা তোমাদের আশা করি জানিয়ে দিতে হবে না।'

লাঞ্চের পরে যার যার রূমে পৌঁছে দেয়া হলো ওদের।

স্যাতোর রূমগুলো সব আলাদা আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্যুইট। প্রত্যেকটার একটা করে নাম আছে। নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত লোক বা জায়গা কিংবা ফ্রান্সের ইতিহাসের পাতা থেকে। রূপা

পেয়েছে 'লি-রয় সোলেইল'। রানার স্যুইটের নাম 'লুই সিজ'। ডেভিডের 'নেপোলিয়ান স্টার্ক'।

প্রথম সুযোগেই 'লুই সিজে' এসে হাজির হলো রূপা।

'রাধা কি অভিসারে বের হয়েছেন?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাকে না দেখে দু'দণ্ডও টেকা যাচ্ছে না?'

'ফাজলামি রাখো তো? ব্যাপার খুব সিরিয়াস।' গম্ভীর ভাবে বলল রূপা।

'সিরিয়াস? আবার কি ঘটল?'

রূপা উঠে গিয়ে ট্র্যানজিস্টারের ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়ে রানার কাছ ঘেঁষে বসল। 'ডেভিড ফ্রস্ট!' প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল রূপা।

'কি করেছে ব্যাটা?'

'এক সময়ে সি আই এর অস্ত্র-শস্ত্রের ইনস্ট্রাক্টর ছিল। কয়েক বছর আগে ওর কাছে আমি অস্ত্রের ওপর একটা কোর্স করেছি। যদি চিনে ফেলে? যদি ফাঁস করে দেয়?'

'হুঁ!'

'কি করব এখন?'

'ডেভিড যে তোমাকে চেনে তার কোন ইঙ্গিত দিয়েছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে রূপা বলল, 'না, তবে তার আমাকে না চেনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।'

'তোমার ধারণাই হয়তো ঠিক- তবে এখন আর কিছু করারও নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হবে আমাদের। যদি কথাটা কবির চৌধুরীর কানে যায়, সাথে সাথেই জানতে পারব আমরা। ওই আস্তাবলের পাশের মাঠে আমাদের নিয়ে লাইভ টারগেট প্র্যাকটিস করবে ওরা। এতক্ষণেও যখন বলেনি তাহলে হয় তোমার ধারণা ভুল, ও তোমাকে চিনতে পারেনি কিংবা তার নিজস্ব কোন গোপন

অভিসন্ধি আছে।'

'টারগেট প্র্যাকটিসে যদি যেতেই হয় তাহলে কয়েকটাকে নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, তবে তার আগে মাথা ঠাণ্ডা আর চোখ কান খোলা রাখাটাই হবে আসল কাজ।'

প্রাসাদের লাইব্রেরী ঘরটা সত্যিই খুব দামী দামী জিনিস দিয়ে সাজানো। গোলাপ কাঠ দিয়ে তৈরি দরজা জানালার প্যানেল। সূক্ষ্ম সব কারুকাজ করা হয়েছে কাঠের ওপর। একটা বিশাল কাশ্মীরী কার্পেট দিয়ে মাঝখানটা ঢাকা। প্রত্যেক শেলফের কাছেই মই রাখা আছে বই নামাবার জন্যে। আর সবচেয়ে উঁচু শেলফ থেকে বই পাড়ার জন্যে রয়েছে ট্রলির উপর সিঁড়ি। পড়ার টেবিলগুলো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত- আর বসার জন্যে রয়েছে মোটা গদিওয়ালা সোফা। সেগুলোও গোলাপ কাঠের। প্রচুর ড্রিঙ্কস আর সুস্বাদু খাবার সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপরে।

রবার্ট গোমেস আর ব্যারি হোমসের সাথে সবাই অপেক্ষা করছে বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাৎকারের জন্যে। আজ সকালেই কবির চৌধুরী প্রথম মুখোমুখি হচ্ছে সবার।

বাঁধা ধরা রুটিনেই রবার্ট সারা ঘর ভাল মত চেক করেছে। সে যে কাউকে বিশ্বাস করে না, এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

আরাম করে হেলান দিয়ে বসে একটা চেস্টারফিল্ড ধরাল ডেভিড। সামনেই হোয়াইট পোর্টের গ্লাস। মাঝে মধ্যে একটা দুটো পনিরের তৈরি নোনতা বিস্কুট মুখে দিচ্ছে।

রূপা বসেছে একটা চেয়ারে- কারও সন্দেহের উদ্রেক না করে ডেভিডের চেয়ে যতটা দূরে বসা সম্ভব। মেয়েলী চেহারার

বিরাটকায় দৈত্য বিশেষ, ইন্দোনেশিয়ান লেপং, সারাটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছে অবাক বিস্ময়ে- ও ভেবেই পাচ্ছে না এত বই একটা লোকের কি কাজে আসতে পারে? দিনরাত পড়েও তো কেউ শেষ করতে পারবে না এত বই।

রানা খুব গভীর মনোযোগের সাথে একটা কাগজ দেখছে, কাগজটার হেডিং হচ্ছে 'টপ সিক্রেট ইউ এস আর্মি অর্ডন্যান্স BAT গাইডেন্স সিস্টেম'। ভাল করে পরীক্ষা করে রানা বুঝল কাগজটা মেকী নয়। এটা এখানে কেন, কিভাবে!

কবির চৌধুরী ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে। ছদ্মবেশ ধারণে জুড়ি নেই তার। এমন কি রবার্ট পর্যন্ত অবাক হলো। গতকালও যেমন দেখেছিল তেমন আর নেই আজ। এখন তার চুল খয়েরী রঙের, লম্বায়ও যেন একটু বেশি মনে হচ্ছে গতকালের চেয়ে। আগের তুলনায় মুখটাও অনেকটা ভরা। বয়সও দশ বছর কমে গেছে তার। পরনে ঘোড়সওয়ারের পোশাক। বুট জোড়া অস্বাভাবিক রকম চকচক করছে। এক হাতে তার রাইডিং স্টিক। চামড়ার ঝালর কাটা বেতের শেষ প্রান্ত আনমনে মৃদু মৃদু ঠুকছে সে টেবিলের সাথে।

অভিজাত ইংরেজী উচ্চারণে সে আরম্ভ করল, 'সুপ্রভাত। যাদের সাথে আগে থেকে পরিচিত নই তাদের জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ। শত শত নামে আমি বিশ্বের দরবারে পরিচিত, কিন্তু কবির চৌধুরী নামটাই আমার পিতৃ প্রদত্ত। এই নামটাই আপাতত ব্যবহার করছি আমি।' এইটুকু বলে একে একে সকলের মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। কি দেখল তা সে নিজেই জানে।

রানা এতক্ষণ বেশ টেনশনে ছিল। কবির চৌধুরীর দৃষ্টিটা সরে

যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কবির চৌধুরী চিনতে পারেনি তাকে। অবশ্য এজন্যে কবির চৌধুরীকে দোষ দেয়া যায় না, তার চোখের জ্যোতি কমে এসেছে। তবে একটা জিনিসের ওপর বাজি ধরেছিল রানা, একজন বাঙালী কোনদিনই একজন প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড চুলের লোককে বাঙালী বলে চিনতে পারবে না। রানার চুল এখন ব্লীচ করার ফলে প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড।

'আশা করি তোমরা সবাই শুনে খুশি হবে যে আমার কমপিউটরে তোমাদের সবার পরিচয় যাচাই করে জানা গেছে যে তোমরা সবাই সঠিক পরিচয়ই দিয়েছ। রবার্টের রিপোর্টে জানলাম তোমাদের যে সব জায়গায় জন্ম দাগ বা অন্য আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আছে বলে আমাদের ফাইলে রিপোর্ট আছে, সেগুলো হুবহু মিলে গেছে।' ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুকটা, ভাগ্যিস পিটার উডককের জন্ম দাগ দুটো ট্যাটু করিয়ে নিয়েছিল- নইলে আর ওই অ্যানেসথেশিয়া থেকে জাগতে হত না তার। একটু থেমে আবার শুরু করল কবির চৌধুরী, 'তবু নিরাপত্তার খাতিরে আমি এখনও বলব, যদি কারও সম্পর্কে তোমাদের কারও বিশেষ কিছু তথ্য জানা থাকে যা এই প্রজেক্টের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, তবে সেটা প্রকাশ করার এটাই যথার্থ সময়।' চুপ করল কবির চৌধুরী।

নীরবতা নেমে এল ঘরের মাঝে। জমে একেবারে পাথর হয়ে গেছে রূপা। ভয়ে সে ডেভিডের দিকে তাকাতেও পারছে না।

রানা একটু ডানে সরে গিয়ে রবার্টের আরও কাছাকাছি দাঁড়াল। দরকার মত ব্যবস্থা নিতে হবে। রানা লক্ষ করল রূপার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ডেভিড। আরও এক পা সরল রবার্টের দিকে। ও জানে এই রূমে একমাত্র রবার্টই অস্ত্রধারী, ব্যারি অনুপস্থিত এই মুহূর্তে, কি একটা কাজে গেছে কবির

চৌধুরীর আদেশে। চট করে দরজার বাইরেটা একবার দেখে নিল সে। সেই আস্তাবলের মাঠে গুলির খেলা দেখানো ইন্সট্রাক্টর দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছেই, ঘরে। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে ওদের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে। সাব মেশিনগানটা ঝুলছে ওর কাঁধে।

ঘরটার দিকে মনোযোগ দিল রানা। অনেক কিছুই তার চোখে পড়ছে এখন যেগুলো আগে চোখে পড়েনি। ঘরের ডান কোণে উপরে সিলিঙের কাছে টেলিভিশন ক্যামেরা লুকানো রয়েছে। রানার দৃঢ় ধারণা হলো ছাতের একটা খাঁজের পিছনে ফিট করা আছে মেশিনগান। নাকি রূপার বিপদের সম্ভাবনায় মিছেই সে এখন সবকিছুরই মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে?

ডেভিডের দৃষ্টি এখনও রূপার উপরেই নিবদ্ধ। রূপার নজর মেঝের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাকে হুলের মত বিঁধছে যেন। আর পারল না সে, মুখ তুলে সরাসরি চাইল ডেভিডের চোখের দিকে। চোখাচোখি হতেই মুচকি হেসে নিজের আঙুল নিয়ে খেলতে খেলতে আরাম করে সোফায় হেলান দিয়ে বসল ডেভিড।

রূপার বুকের ভিতরটা উত্তেজনায় ঢিপ ঢিপ করছে। রানা একটু নড়েচড়ে উঠল অস্বস্তিতে। প্রতিটি পেশী তার টানটান হয়ে রয়েছে। ডেভিড মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে রবার্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে প্রস্তুত। রবার্টের পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে পারলে পালাবার একটা সুযোগ মিলতে পারে। কিন্তু কেউই মুখ খুলল না। না ডেভিড, না ঘরের অন্য কেউ।

'চমৎকার,' বলে উঠল কবীর চৌধুরী। 'দেখা যাচ্ছে আমরা সবাই পরস্পরকে বিশ্বাস করি। হয়তো পছন্দও করব। আমি দেখেছি তাতে কাজের অনেক সুবিধা হয়। বন্ধুত্ব- ঠিক আছে-

কিন্তু গলায় গলায় ভাব হয়ে যাওয়াটা আমি ভাল মনে করি না।'

ঘরের ভিতর থেকে থমথমে ভাবটা কেটে গেল ধীরে ধীরে। রূপা মনে মনে চিন্তিত ডেভিডের দৃষ্টির সামনে তার অপ্রস্তুত আর অপ্রতিভ হয়ে পড়াটা কারও চোখে পড়ে যায়নি তো? ডেভিড কি চিনতে পারেনি ওকে? দ্বিধায় আছে? নাকি ওর পরিচয় প্রকাশ করে দেয়ার জন্যে আরও উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় রইল সে?

'ভাল কথা,' কবির চৌধুরী আবার আরম্ভ করল, 'এখানে কারও কি উচ্চতা ভীতি আছে?'

নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই একযোগে পুতুল নাচের পুতুলের মত মাথা নেড়ে জানাল, নেই।

'পিটার উড্‌কক, তুমি একজন ফরাসী সেজে একজন সত্যিকারের ফরাসী লোকের চোখে ধুলো দিতে পারবে?'

'উন মর্‌সিউ দ্য গ্যাতু।' ফরাসী ভাষাতেই জবাব দিল রানা। 'অবশ্যই পারব।'

খুশি হয়ে উঠল কবির চৌধুরী। বলল, 'গুড।' এবার রূপার দিকে ফিরল সে, 'ওয়েল্ডিঙে বিশেষ দক্ষতা আছে এমন দুজন মানুষ আমার দরকার। সুজানা, তোমাকে টিচের সাথে কাজ করতে হবে।'

রূপা টিচের দিকে চেয়ে নড্ করল- জবাবে শুধু দুবার চোখের পাতা পড়ল টিচের।

'প্রাথমিক নির্দেশ আপাতত এখানেই শেষ,' ঘোড়া চালানোর ছড়িটা দিয়ে নিজের গ্লাভস পরা হাতে শব্দ তুলে দুবার আঘাত করল সে, 'অবশ্যই পরে আরও নির্দেশ দেয়া হবে তোমাদের। টারগেট কি, কোন্ দিন, কোন্ সময়ে আমরা আঘাত হানছি, এইসব খুঁটিনাটি সব কিছু সময় মত জানানো হবে। এবার কিছু

আলোচনা হোক। একটা জরুরী তথ্য আমাদের সবারই জানা দরকার। ল্যাপ লেজার জিনিসটা কি তা ব্যাখ্যা করে শোনাবে তোমাদের প্রাক্তন সি.আই.এ ইন্সট্রাক্টর মিস্টার ডেভিড ফ্রস্ট।' হাত তুলে ডেভিডকে বলতে ইঙ্গিত দিল সে।

সোজা হয়ে বসে আরম্ভ করল ডেভিড, 'ল্যাপ লেজার একটা দুর্দান্ত স্বয়ংক্রিয় মারণাস্ত্র। লেজার সজ্জিত, অটো রিচার্জিং- বেশি টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে না তো? কঠিন লাগলে থামিয়ে দিয়ো- লাগছে না- বেশ। এটা এক হাজার গজ পর্যন্ত যে কোন জিনিস সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ল্যাপ লেজার যে গাইডেন্স পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটা বি.এ.টি. নামে পরিচিত।

'রাশিয়া ও আমেরিকা এই দুটি দেশই অনেকদিন ধরে এই অস্ত্রটাকে উন্নত আর অব্যর্থ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কেউই বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। আমেরিকানরা গাইডেন্স সিস্টেমে একটা নতুন জিনিস ব্যবহার করে বিশেষ ফল পেয়েছে। আদি রাডার বাতিল করে এখন দুই ক্ষেত্রেই লেজার ব্যবহার হচ্ছে। এটা যদিও এখন পর্যন্ত তেমন স্থিতিশীল নয়, বরং একটু বিশৃ^লই বলা যেতে পারে- তবু মোটামুটি কাজ করছে এটা এখন।

'মাসখানেক আগে বাফেলোর জেনারেল ইলেকট্রিক করপোরেশন বারোটা নমুনা তৈরি করে দেয়, তার কয়েকটা ইউ এস আর্মি বিভিন্ন টেস্ট সাইটে পাঠায়। ইউরোপেও পাঠানো হয় চারটে। স্টুটগার্টের কাছে একটা গোপন পরীক্ষা কেন্দ্রে এগুলোর ব্যবহার ও শক্তি পরীক্ষা করা হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখান থেকে সব কটাই চুরি হয়ে যায়। ইউ এস আর্মি ব্যাপারটাকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে। তাদের অনুসন্ধানের কাজও চলেছে খুব সতর্কভাবে, গোপনে।

‘আমাদের জন্যে একটা সুসংবাদ, ওগুলো মশিয়ে চৌধুরীর নির্দেশে আমিই চুরি করি। সম্ভবত ওগুলো এখন স্যাতোতেই আছে।’ এই পর্যন্ত বলে কবির চৌধুরীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ডেভিড। একটু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল কবির চৌধুরী।

‘খুব ভাল কথা। আমাদের টারগেট যত কঠিনই হোক না কেন, সন্দেহ নেই, ল্যাপ লেজার সেটাকে সহজ-সাধ্য করে তুলবে। এগুলো সত্যিই আশ্চর্য ক্ষমতা রাখে। অনেক শক্তি প্রয়োজন হয় ল্যাপ লেজারের, ওগুলো চালাতে একটা ছোটখাট শহর চলার জন্যে যত শক্তি দরকার হয় প্রায় ততখানিই শক্তি লাগে, কিন্তু এর ধ্বংস ক্ষমতা এতখানি যে মাঝারি রকেট গানকেও এর কাছে মনে হবে খেলনা পিস্তল। চার-চারটে ল্যাপ লেজার নিয়ে আমরা ইচ্ছে করলে একটা ছোটখাট দেশের গোটা আর্মিকে ঘোলাপানি খাইয়ে দিতে পারি।’ বক্তব্য শেষ করল ডেভিড।

কবির চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসির রেখা দেখা দিল। ‘মজার ব্যাপার এই যে আমাদের হয়তো ঠিক সেটাই করতে হতে পারে।’

বিস্ময়ে চমকে গেছে রানা আর রূপা দুজনেই। বিরাট দেহধারী টিচ্, হাতের আঙুল মটকাতে মটকাতে খিক খিক করে হাসতে লাগল অকারণেই।

জানাবে বললেও কাউকে কিছুই জানাল না কবির চৌধুরী। বোঝা গেল একেবারে শেষ মুহূর্তে তার প্ল্যান জানাবে সে সবাইকে। ট্রেনিং চলছে সবার। ল্যাপ লেজারের সাথে অন্যান্য আরও সব

ট্রেনিং, একোয়ালাঙ ডাইভিং, খালি হাতে কমব্যাট, রাইফেল, মেশিনগান ইত্যাদির টারগেট প্র্যাকটিস, জিমনাস্টিক্‌স (দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা আবার নামা) কোনটাই বাদ নেই। রানা আর রূপা পড়েছে ফাঁপরে। প্ল্যান না জানা পর্যন্ত বাধা দেয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। এখান থেকে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করারও কোন উপায় নেই। আরও দুর্ভাবনার কারণ হচ্ছে রাহাত খান তাদের অবস্থান জানেন না। সুতরাং বাইরে থেকে যে কোন সাহায্যের আশা নেই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা চলে। কিছুই করার নেই ওদের।

কিন্তু, ওদের এই ধারণাটা ভুল। রাহাত খান ভাল করেই জানেন রানা আর রূপা কোথায় আছে। এয়ারফোর্সের একটা ব্ল্যাকবার্ড মাখ্ থ্রী ব্যবহার করে কবির চৌধুরীর স্যাতোয় তিনি ঠিকই খুঁজে বার করেছেন হেলিকপ্টারটাকে। প্লেন থেকে দূরবীন দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রের অনেক মহড়াও দেখা গেছে- ভাল ঠেকছে না ব্যাপারটা রাহাত খানের কাছে। এত কিছু দেখেও কোন লাভ নেই। কারণ, আসল প্ল্যানটা কি, আর তা কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে কিছুই জানা নেই তাঁর। সোহানার সাথে গল্প করে রিজে সময়টা মন্দ কাটছে না। যদিও উদ্বেগ আছে কিছুটা। তিনি কবির চৌধুরীর প্রথম পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ফরাসী বা আমেরিকান ট্রুপ নিয়ে স্যাতো আক্রমণের ঝুঁকি নিতে রাজি নন রাহাত খান। ওই লেজার গানের সামনে কচুকাটা হয়ে যাবে আর্মি। কাজেই চুপচাপ কবির চৌধুরীর ওপর নজর রেখে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

ওদিকে স্যাতোয় সময়টা ট্রেনিঙের মধ্যে দিয়ে বেশ দ্রুতই কাটছে বলতে হবে। এস্টেটটা ঘুরিয়ে দেখানোর পরে কবির

চৌধুরী সহ সবাই একদিন আস্তাবলের সামনের মাঠে জড়ো হলো।

সুন্দর নিরিবিলি একটা মনোরম সন্ধ্যা। কিন্তু কবির চৌধুরীর হাতের ইশারায় হঠাৎ সুন্দর পরিবেশটাকে চমকে দিয়ে কান ভোঁ ভোঁ করা গর্জন উঠল। আর প্রায় সাথে সাথে পুরো জায়গাটা তীব্র আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেল। অনেক আর্ক ল্যাম্প জ্বলে উঠেছে ছাতের ওপর, কয়েকটা আবার খুঁটির সাথে ঝোলানো। হাতের ইশারায় সবাইকে আস্তাবলে ঢুকতে বলল কবির চৌধুরী। নিজেও ঢুকল ওদের সাথে।

তিনটে বিরাটকায় জেনারেটর মাউন্ট করা ট্রাক দাঁড় করানো রয়েছে পাশাপাশি। গ্রাউন্ড বা এরিয়াল কোন সারভেতেই ধরা পড়বে না এদের অস্তিত্ব। মোটা মোটা ইলেকট্রিকাল তার দিয়ে তিনটে গাড়ি পরস্পর সংযুক্ত। কয়েকটা টারবাইন জেনারেটর শব্দ তুলে শক্তি উৎপাদন করে চলেছে। এক একটা টারবাইন অদম্য শক্তির ভারে যেন থরথর করে কাঁপছে আর গজরাচ্ছে। শেষ ট্রাকটা থেকে কয়েকটা তার মাঠে কাঠের মঞ্চ পর্যন্ত গেছে। প্রত্যেকটা ট্রাকের গায়েই লেখা 'রেস্তোরাঁ লারোজ'।

প্রায় তিরিশ চল্লিশ জন লোকের সমাবেশ। বেশির ভাগই শিক্ষার্থী। একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্যে ডাকা হয়েছে সবাইকে। ল্যাপ লেজারের শক্তির চমকপ্রদ প্রদর্শনী দেখার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব।

কবির চৌধুরী হাত তুলতেই জেনারেটরের ইঞ্জিনগুলো বন্ধ হয়ে গেল। 'একটা চমক লাগানো স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হবে আজ তোমাদের। ল্যাপ লেজার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবে না- কারণ তা করলে আমার সাধের প্রাসাদ মাটির সাথে মিশে যাবে, এমন সম্ভাবনা আছে।

'আমি তোমাদের দেখাব ল্যাপ লেজার কিভাবে ক্ষিপ্র আর নির্ভুল পদ্ধতিতে কাজ করে যেতে পারে। অন।' আদেশ দিল সে।

সাথে সাথেই জেনারেটরগুলো দ্বিতীয়বারের মত বিকট আওয়াজ তুলল। কাঠের প্ল্যাটফর্মটার ওপর বসেছে ডেভিড, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ওর। অনেকগুলো লাইট তার উপর ফোকাস করা হয়েছে। তার সামনেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লিভার। মাত্র তিন ফুট দূরে লেজার গান। নাকটা তার লম্বা। আর ইঁদুরের কানের মত তার দুটো ডিটেক্টর। যেন সজীব এক বিভীষিকা। ডেভিড, রানা আর লেপং কমপিউটর নিয়ে ব্যস্ত। রূপা আর টিচ একটু দূরেই দাঁড়িয়ে।

উঠে দাঁড়াল ডেভিড, ল্যাপ লেজার গানটাকে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে আদর জানাল- তারপর কবির চৌধুরীকে বুড়ো আঙুল দেখাল। অর্থাৎ সব রেডি- ল্যাপ লেজার এখন যে কোন কিছু মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত।

ব্যারি হোমসের দিকে চেয়ে নড্ করল কবির চৌধুরী। ব্যারি একটা রিমোট কন্ট্রোল সুইচ টিপে দিল। মাঠের এই প্রান্তেই পঞ্চাশ গজ দূরে একটা সিগন্যাল গেল। সেখানে মোটা সীসার পাতের আড়াল থেকে চারজন লোক রাশান কালাসনিকভ এ, কে ৪৭ রাইফেল দিয়ে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল মাঠের অপর প্রান্তের টারগেটের দিকে।

ডেভিডের হাত দ্রুত খেলে গেল কয়েকটা সুইচের ওপর। ল্যাপ লেজার থেকে রশ্মি বেরিয়ে গেল। প্রত্যেকটা বুলেট ধ্বংস হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কোন গতিশীল বস্তুরই প্রবেশ ক্ষমতা নেই লেজার গানের আওতায়। একটা গুঞ্জন উঠল বিস্ময়ের।

ল্যাপ লেজারের ক্ষমতা দেখে সবাই স্তম্ভিত। সবাইকে চুপ

করতে বলে কবির চৌধুরী টারগেটের দিকে এগোল। হাতে একটা মাইক্রোফোন। 'একটা গুলিও টারগেটে লাগেনি,' মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল কবির চৌধুরী। সব কয়টা বুলেটই ধ্বংস করেছে ল্যাপ লেজার। এই রকম চারটে ল্যাপ লেজারের অধিকারী এখন কবির চৌধুরী।

ধীর পায়ে ফিরে এল সে। ডেভিডকে অভিনন্দন জানাল। একটু বাঁকা হাসি ফুটল ডেভিডের ঠোঁটের কোণে।

হঠাৎ রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী, 'উডকক, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে?'

'সম্ভবত,' বলে কবির চৌধুরীর দিকে চাইল রানা। বলল, 'আমার ধারণা, ল্যাপ লেজারটাকে এখন ওই চাকতির সঙ্গে টিউন করা হয়েছে।' ডেভিডের হাতে ধরা চাকতিটার দিকে নির্দেশ করল রানা। 'এটা সাথে থাকলে আক্রমণ করবে না লেজার।' সন্দিগ্ধ চোখে চাইল সবাই ওটার দিকে। কেউ ভাবতেই পারছে না, এরকম দুর্ধর্ষ ল্যাপ লেজারকে ওই ছোট্ট একটা ধাতব চাকতি কিভাবে ঠেকাতে পারে।

'যে কোন ধাতুর বেলাতেই এটা সম্ভব,' বলল রানা। 'টারগেট চিনে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে ল্যাপ লেজার। কোন কিছু ধ্বংস করতে না চাইলে এই কমপিউটরে সেটা আগে থেকে সেট করে রাখলে সেটাকে চিনে ফায়ারিং বন্ধ রাখবে ল্যাপ লেজার।'

'তুমি এই ব্যাপারে শিওর?' রানার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা জানাল, হ্যাঁ, সে নিশ্চিত। মুখে বলল, স্পরীক্ষা করা হয়নি, তবে যা বলেছি তা ঠিক।'

'তাহলে তুমিই ওটা নিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও- পরীক্ষা

হয়ে যাক। আমরা দেখতে চাই ল্যাপ লেজার তোমার দিকে ফায়ার করে কিনা।' সবাইকে স্তম্ভিত করে প্রস্তাব দিল কবির চৌধুরী।

রানার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই গম্ভীর হয়ে গেল সে, 'আপনি কি চান আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে ওই চাকতি নিয়ে ল্যাপ লেজারের সামনে দাঁড়াই?' চড়া গলায় প্রশ্ন করল রানা, 'আমার কথাটা প্রমাণ করার জন্যে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ তুমি- আমি প্রমাণটাই চাই।' ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল কবির চৌধুরী।

শ্বাসরুদ্ধকর একটা পরিবেশ নেমে এল সহসা। সবাই উৎকণ্ঠিত। ল্যাপ লেজারের ক্ষমতা একটু আগেই নিজের চোখে দেখেছে সবাই।

'ঠিক আছে, তাই হবে।' ডেভিডের হাত থেকে নিয়ে চাকতিটা টস্ করার ভঙ্গিতে শূন্যে ঘুরিয়ে আবার ধরল রানা।

কবির চৌধুরী ইশারা করতেই জেনারেটরগুলো গর্জে উঠল আবার। ডেভিড কন্ট্রোল প্যানেলে, আর টিচ বসেছে কমপিউটরে। চাকতিটা বুক পকেটে ঝুলিয়ে এগিয়ে গেল রানা মাঠের প্রান্ত পর্যন্ত । এবার এগিয়ে আসছে রানা ল্যাপ লেজার গানের দিকে। তার পদক্ষেপে কোন তারতম্য হলো না, দৃঢ় পদক্ষেপেই সে এগিয়ে আসছে বটে, কিন্তু রক্ত তার জমে বরফ হয়ে গেছে। ক্ষিপ্র হাতে ল্যাপ লেজারের সুইচ আর লিভারগুলো নাড়াচাড়া করছে ডেভিড। লেজার গানের মুখ এখন সোজা রানার দিকে তাক করা। সারা শরীরের রোমগুলো কেমন শিরশির করে উঠল। রানার সাথে সাথে ল্যাপ লেজারের নলটাও নড়ছে- সব সময়েই তাকে কাভার করে

রাখছে ওটা।

ল্যাপ লেজার ফায়ারিং-এর ভোঁতা শব্দটা কানে এল রূপার। ফায়ার করেছে লেজার! কিন্তু ফায়ারিং মেকানিজমটাই কেবল কাজ করল- টিউবের মাথায় কোন রশ্মি দেখা গেল না। ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল রূপা। এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল সে।

'কিছু নষ্ট হয়নি- ঠিক কাজ করছে ওটা?' প্রশ্ন করল কবির চৌধুরী।

কাষ্ঠ হাসি হাসল ডেভিড। আর একটা লীভার টানতেই নতুন একটা টারগেট ইলেকট্রনিক পুলির ওপর দেখা গেল। ধীরে ধীরে ওটা ল্যাপ লেজারের রেঞ্জে প্রবেশ করল। হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়িয়েছে রানা- দেখছে কি ঘটে।

সাঁই করে ফিরল লেজার গান টারগেটের দিকে। চোখের পলক না পড়তেই ফায়ার করল- নিমেষে মিলিয়ে গেল ওটা। দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে এল রানা ল্যাপ লেজারের কাছে। বুক পকেট থেকে ট্যাগটা খুলে নিয়ে কবির চৌধুরীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল। 'এই নিন আপনার নিরাপত্তার চাকতি।' একটু রোষের সাথেই বলল রানা।

অপমানটা গায়েই মাখল না কবির চৌধুরী। সে এখন টাকার স্বপ্ন দেখছে- অনেক টাকা! বড় দুশ্চিন্তা ছিল তার- প্ল্যানে এক জায়গাতেই একটু ফাঁক ছিল- সেই ফাঁকটাও আর থাকল না। এখন তাকে ঠেকায় এমন সাধ্য কার?

খুশিতে ঝলমল করছে কবির চৌধুরীর চোখ-মুখ। 'তোমরা সবাই নিজের চোখেই দেখেছ এবং প্রমাণ পেয়েছ ল্যাপ লেজার কমপিউটরে প্রোগ্রাম করা থাকলে এটা শুধু নির্বাচিত টারগেটকে আক্রমণ করবে- অর্থাৎ শত্রু বন্ধু চেনার ক্ষমতা এর আছে।' মাটি

থেকে চাকতিটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কবির চৌধুরী। 'এই রকম ট্যাগ আমার কাছে আরও আছে- তালাচাবি দেয়া। সময় মত বের করা হবে সেগুলো। প্রাসাদের ছাতের ওপর একটা ল্যাপ লেজার ফিট করা রয়েছে, অর্থাৎ বাইরের অবাÔত কেউ আর স্যাতোর ভিতর ঢুকতে পারবে না। আমি আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাপারটা উল্টোভাবেও সত্য- মানে, স্যাতো থেকেও কেউ আর বাইরে বেরোতে পারবে না। গুড্ নাইট।' কথা শেষ করেই প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করল কবির চৌধুরী, পাশে ব্যারি হোমস।

পরদিন সকালে ট্রাকে করে আবার ওদের পুরো দলটাকে নিয়ে যাওয়া হলো পার্কের মধ্যে একটা নির্জন জায়গায়। সবাই শাপলা পুকুরটার ধারে মিলিটারি কায়দায় লাইন করে দাঁড়াল। পুকুর পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে খুঁটি আর তক্তা দিয়ে তৈরি একটা ষাট ফুট উঁচু কাঠামো। ব্যারি হুইসেল বাজাতেই সবাই কাঠামোটা বেয়ে ওপরের দিকে ওঠা আরম্ভ করল। নিরিবিলি পার্কের মধ্যে ওটাকে একটা অ্যাক্রোব্যাটদের জিমনাশিয়ামের মতই দেখাচ্ছে- আসলেও ওটা তাই।

কবির চৌধুরী হাজির হলো। প্রতি দিনের মত আজও তার হাতে একটা স্প ওয়াচ। নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বেয়ে উঠতে কার কত সময় লাগছে সেটা চেক করছে সে। বুরুজের মাথায় কয়েকটা লোহার মোটা পাত বসানো হয়েছে। রূপা আর টিচ্ দুজনে দুদিকে দুটো তক্তার ওপর বসে ওয়েল্ডিং-এর কাজে ব্যস্ত।

রানার পায়ের কাছে এসে পড়ল উপর থেকে ঝুলানো একটা দড়ি। তরতর করে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে রূপার সাথে যোগ দিল সে। ডেভিড দড়ির মাথায় ল্যাপ লেজার বেঁধে দিতেই টিচ

অনায়াসে টেনে তুলে ফেলল ওটাকে উপরে। দ্বিতীয় ল্যাপ লেজারটাও একই ভাবে দড়ির সাহায্যে উপরে তুলল রানা আর টিচ দুজনে মিলে। ক্রসবীমে বসানোর সঙ্গে-সঙ্গে স্প ওয়াচে সময় দেখল কবির চৌধুরী। ওদের ক্ষিপ্রতায় বেশ সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে।

লেপং আর তার সঙ্গী, দুজনের হাতেই ইলেকট্রিকাল কাজের হেভি ডিউটি গ্লাভস পরা, অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কাজ করছে। প্রায় প্রত্যেকটা জিনিসের গায়েই বজ্রের আঁকাবাঁকা চিহ্ন আঁকা। পাশেই লেখা, 'সাবধান ২০০০ ভোল্ট'।

লেপং এর সঙ্গী খুব সাবধানতার সাথে তারের উপরকার আবরণ লম্বা করে কাটল। ইনসুলেটেড-সাঁড়াশি দিয়ে মুচড়ে কাটা ইনসুলেটার ছিঁড়ে ফেলল তারের উপর থেকে। চকচকে মোটা তামার তার অনাবৃত হলো। গ্লাভস খুলে সে ঝুঁকে পড়ে একটা ক্ল্যাম্প তুলে নিল হাতে। এটারও হ্যান্ডেল আর নাটে ইনসুলেশন রয়েছে। তারের উপর ক্ল্যাম্প বসিয়ে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, থরথর করে কাঁপছে ওর হাত। প্রায় অনিবার্য ভাবেই তার হাতটা ফস্কে গিয়ে ক্ল্যাম্পের ধাতব অংশে লাগল। প্রচণ্ড একটা নীল আর্ক দেখা গেল। মুহূর্ত খানেক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢলে পড়ল দেহটা।

জেনারেটর বন্ধ করে মৃতদেহটাকে সরানো হলো। পোড়া মাংসের কড়া গন্ধটা মিলিয়ে যাওয়ার পর নিজেই কাজটা নির্ভুল ভাবে সম্পন্ন করল লেপং।

কঠোর ট্রেনিং নিয়ে কাটল ওদের আরও একটা সপ্তাহ। দড়ি বেয়ে নামা ওঠা, বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার, এইসব চলেছে সারা সপ্তাহ। তারই ফাঁকে ফাঁকে চলেছে ছাঁটাই-বাছাই।

আজও ওরা সবাই পুকুর পাড়ে জড়ো হয়েছে। স্প ওয়াচ নিয়ে দাঁড়িয়ে কবির চৌধুরী। ডেভিড একাই আজ উপরে উঠেছে। অত্যন্ত দ্রুত সে চারটে খুঁটিতেই প্লাস্টিক বিস্ফোরক বসিয়ে ডেটোনেট করে নেমে এল। দৌড়ে গিয়ে কবির চৌধুরীর ঘাড়ের উপর দিয়ে স্প ওয়াচ দেখছে। দেখল কাঁটাটা ঘুরে শূন্যে ফিরে গেল। চারটে মাঝারি রকম বিস্ফোরণ হলো। হুড়মুড় করে কাঠামোটা ভেঙে নিচে পড়ল ওদের চোখের সামনে। খুব খুশি দেখাচ্ছে আজ কবির চৌধুরীকে। অবশ্য খুশির কোন কারণ ব্যাখ্যা করল না সে।

সেই রাতে ডিনারে বসেছে সবাই- উজ্জ্বল ঝালর বাতির আলোয় ঝকঝকে রূপার থালায় খাচ্ছে ওরা। কবির চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে তালি দিয়ে মৃদু গুঞ্জন থামিয়ে আরম্ভ করল, 'গত দশ দিনে তোমরা সবাই আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ দেখিয়েছ। প্ল্যান মত কাজ উদ্ধার করার জন্যে যে সব শারীরিক ও মানসিক কসরত দরকার হবে, সবগুলোই তোমরা অত্যন্ত ভাল ভাবে রপ্ত করে নিয়েছ। তোমাদের জন্যে আমি গর্বিত। এখনও যদি তোমাদের না জানাই আমার প্ল্যানটা কি তবে সেটা খুবই নিষ্ঠুরতা হয়ে যায়।'

ধীরে ধীরে পুরো প্ল্যানটা খুলে বলল কবির চৌধুরী। প্রত্যেকটা বিষয়ের খুঁটিনাটি পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করল। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনল সবটা নীরবে।

ফিসফিস করে রূপা বলল রানাকে, 'লোকটা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ।'

সাত

আরও কয়েকটা দিন পরের কথা।

ভোরেই উঠেছে সোহানা। হোটেল ছেড়ে অপূর্ব সুন্দর স্কোয়ার প্লেস ভেনডোমে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার একটাই চিন্তা- এমন অদ্ভুত একটা জায়গায় কেন তাকে বুড়ো সকাল আটটার সময়ে দেখা করতে বলল? দেখা করতে অবশ্য বলেননি তিনি, আজ সকালে উঠে সে দেখে মেজর জেনারেল তাঁর ঘরে নেই- তার জন্যে কেবল একটা ছোট্ট নোট রয়েছে, তাতে লেখা, 'লা স্যাত কুই সিফল', সকাল আটটা পর্যন্ত থাকবেন তিনি সেখানে। আটটা বাজতে দেরি আছে- হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করল সোহানা কিছু উইনডো শপিং করবে। রু-দু ফবর্গ সেন্ট অনর হয়ে রু ক্যাস্টিলিয়ন, বুলেভার্ড হাউসমান, বুলেভার্ড ব্যাটিনোল, বুলেভার্ড কুরেল ঘুরে আর্ক দ্য ট্রায়াম্প-এ এসে পৌঁছল সোহানা।

একটা বাস নিয়ে ক্লেবার এভিনিউ ধরে প্যালেস দ্য শাইলোতে এসে নামল। নদীর ধারে টাওয়ার পার হয়ে বুলেভার্ড গারিবালডি। ঘড়িতে দেখল পৌনে আটটা বাজে।

মিলিটারি স্কুলের পিছনে একটা ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে দেখতে পেল সে 'লা স্যাত কুই সিফল'। মেহনতি মানুষদের জন্যে

ছোট্ট একটা কাফে। প্রায় চার ভাগের তিনভাগ ভর্তি রয়েছে লোকের ভিড়ে- বেশির ভাগই শ্রমিক।

কোণের দিকে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সোহানা। একটা খবরের কাগজে প্রায় সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে বসে আছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। সামনে কফির কাপ। প্রিয় ক্যাফেতে এরই জন্যে আসে বুড়ো সময় পেলেই। কফিটা সত্যিই ভাল।

'বসো।' কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বললেন রাহাত খান।

ও যে এসেছে তা কাগজ থেকে চোখ না সরিয়ে কি করে জানলেন উনি? অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে বসল সোহানা। ওয়েটার এসে দাঁড়াল সামনে। কফি আর ক্রয়সান্টের অর্ডার দিল সোহানা।

অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'ভোর রাতে তোমাকে জাগাইনি- ভোর পাঁচটার দিকে খবর পেলাম ছয়টা ট্রাক আর হেলিকপ্টার নিয়ে ওরা রওনা হয়েছে। স্যাতোর ছাত থেকে অদৃশ্য হয়েছে লেজার গানটা।' মেজর জেনারেল চুপ করলেন।

'কোন্ দিকে যাচ্ছে?'

'এইদিকেই। হেলিকপ্টারটা প্যারিসেরই কোথাও প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে স্যাতো-য়। ট্রাকগুলো এখনও এসে পৌঁছায়নি। রানাদের কোন খবর পেলে?'

মাথা নাড়ল সোহানা।

'আজ সকালেও আমি চেক করেছি- রানা বা রূপার কাছ থেকে কোন মেসেজই আসেনি। কোন বিপদ-আপদ হলো কিনা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রূপাকে যদি ওই ফ্রস্ট-ব্যাটা চিনে ফেলে থাকে...রানাও ঝাঁপিয়ে পড়বে রূপার বিপদে...পরিচয় প্রকাশ হয়ে

পড়বে দুজনেরই...'

'হুঁ, চলো হোটেলে ফিরব।' অত্যন্ত গম্ভীর আর কঠিন দেখাচ্ছে মেজর জেনারেল রাহাত খানের মুখ।

বুলেভার্ড গারিবালডি হয়ে ডান হাতে মিলিটারি স্কুল পেরিয়ে ক্যাম্প দ্য মার্সে এল ওরা। সারা পথ কোন কথা বলেননি রাহাত খান। চুরুট ধরাবার জন্যে একটু থামলেন তিনি, এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে আইফেল টাওয়ারের দিকে তাকালেন।

টিচ্ আর লেপং 'লা স্যাত কুই সিফলে' দরজার ধারের টেবিলটা ছেড়ে রাস্তায় নামল। কিছুক্ষণ আগে রাহাত খান আর সোহানা যে পথ ধরে গেছে সেই একই পথে রওনা হলো ওরাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই টাওয়ারের নিচে পৌঁছে গেল ওরা।

পাগলাটে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার গুস্তাভ আলেকজান্ডার আইফেল ১৮৮০ সালের শেষের দিকে আইফেল টাওয়ারের কাজ আরম্ভ করেন। দু'বছর কঠোর পরিশ্রম করে বিকট আকার অথচ সুন্দর এই টাওয়ারের ডিজাইন শেষ করেন।

প্রমাণ সাইজের ডিজাইন করতে আইফেল পাঁচ হাজার এক বর্গগজ কাগজের পাতা ব্যবহার করেছিলেন। প্রায় এক হাজার ফুট উঁচু জিরাফের মত দেখতে এই কাঠামোটা বানাতে পনেরো মিলিয়ন পাউন্ড ধাতু, বারো হাজার টুকরো লোহা আর আড়াই মিলিয়ন রিভেট লেগেছে।

১৮৮৯ সালের ১০ জুন ইংল্যান্ডের প্রিন্স বার্টি আনুষ্ঠানিক ভাবে এর উদ্বোধন করেন। আরও পরের দিকে অয়্যারলেস সম্পর্কে যখন ফলপ্রসূ কাজ চলছিল তখন আইফেল টাওয়ারকে রেডিও ব্রডকাস্টিং টাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গুস্তাভ আইফেল নিশ্চয়ই এতটা কল্পনা করতে পারেননি যে

তাঁর তৈরি এ টাওয়ার পরবর্তী কালে টেলিভিশন ট্র্যান্সমিটার হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। নিঃসন্দেহে তিনি জেনে খুশি হতেন যে তাঁর ৯৮৪ ফুট ৬ ইঞ্চি টাওয়ার এখন রেডিও আর টেলিভিশন দুটোরই ট্র্যান্সমিটার হিসাবে কাজে লাগছে।

টিচ আর লেপং বেলুন বিক্রেতার পাশ কাটিয়ে টাওয়ারে উঠবার প্রবেশ পথের দিকে গেল। সকাল, ভিড় তাই পাতলা। বেলুন বিক্রেতা ডেভিড মোটামুটি ভালই ব্যবসা করছে। গ্যাস সিলিন্ডার সে আগেও ব্যবহার করেছে বলে অসুবিধে হচ্ছে না তার। একটা বেলুনে কিছুটা হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে মন্ত্রমুগ্ধ ছোট্ট ডাচ মেয়েটার হাতে দিল ডেভিড।

'ক্লিক!' একটা দামী ক্যামেরার শাটার পড়ার শব্দ পাওয়া গেল। একটা সুন্দর কাটের হালকা স্যুট পরেছে কবির চৌধুরী- সাথে ম্যাচিং টাই রুমাল আর মোজা। নিজের লোকদের ধোঁকা লাগতে পারে মনে করে মুখের চেহারা আগেরটাই রেখেছে।

আর একটা ছবি তুলল সে। সেন্ট্রাল আর্কটার মধ্যে দিয়ে প্যানেল দ্য শাইলোর ছবি উঠে গেল তার ক্যামেরায়। ধীর পায়ে হেঁটে লিফ্‌টে চড়ল, লিফটের অন্য ধারে কথা বলছে রূপা আর ব্যারি। লিফট প্রথম ল্যান্ডিঙে পৌঁছতেই কবির চৌধুরী নেমে গেল।

ক্লিক করে একটা ছবি তুলল রবার্ট গোমেস। কনুই দুটো রেলিঙে ঠেকিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটো ছোট ছোট করে আইপীসের ভিতর দিয়ে চেয়ে আর একটা অর্থহীন স্ন্যাপ নিল সে।

'রেস্তোরাঁ লারোজ' লেখা তিনটে বিশাল ট্রাক ধীরে গড়িয়ে এসে থামল টাওয়ারের নিচে। একটা সার্ভিস এলিভেটরের কাছে জায়গা মত পার্ক করা হলো। সাদা অ্যাপ্রন পরা শেফ্‌ নামল ট্রাক থেকে। আড়মোড়া ভেঙে বেলুন বিক্রেতাকে চোখ টিপে এগিয়ে

গেল শেফের পোশাক পরা রানা। বাকি তিনটে ট্রাকও যোগ দিয়েছে আগের ট্রাকগুলোর সাথে।

টাওয়ার গার্ডদের একজন অফিস থেকে বেরিয়ে এসে কথা বলছে রানার সাথে। এদিকে একজন লোক লেগে গেছে মালপত্র নামানোর কাজে। দ্রুত কাজ চলছে- এরই মধ্যে অনেকগুলো ক্রেট, স্টীম বক্স, উজ্জ্বল রঙের বিয়ার ট্যাঙ্ক, স্টোভ, মাইক্রোওয়েভ আভ্‌ন্‌- আরও কত কি।

গার্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওই পাহাড় প্রমাণ জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল, 'বাক্স খুলে দেখাও ভেতরে কি আছে।'

'কি!!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। একসেট কাগজপত্র সে গার্ডকে আগেই দেখিয়েছে। ওতেই সব ব্যাখ্যা করে বলা আছে। 'আমাকে ক্রেট খুলে দেখাতে হবে? স্টীম বক্স খুলে দেখাতে হবে? আমার সুফ্লের বারোটা বাজাতে চাও তুমি- আমার সসে ধুলো ফেলে নষ্ট করতে চাও?' বকবক করেই চলল রানা।

রানাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে চাড় দিয়ে স্টীম বক্স খুলে দেখল গার্ড। একটা ক্রেট খুলে গার্ড দেখল কাঁচা রুটি সার বেঁধে সাজানো রয়েছে।

শেফের ভূমিকায় খুব ভাল ভাবেই উতরে গেল রানা। বারবার গালাগাল দিল গার্ডকে এভাবে ঢাকনা খুলে অপূর্ব স্বাদের খাবার নষ্ট করছে বলে।

ডেভিড বেলুন হাতে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা বেশ উপভোগ করল- মনে মনে রানাকে বাহবা না দিয়ে পারল না সে। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চাইল। গ্যাস বেলুনগুলো আরও শক্ত মুঠোয় ধরেছে- একটা হলুদ বেলুন হাত ফসকে ছুটে

গেল। লাফিয়ে শূন্যে উঠে ওটাকে ধরার নিষ্ফল একটা চেষ্টা করল সে। না পেরে হাত ঝাঁকিয়ে হেলে দুলে শূন্যে উড়ে যাওয়া বেলুনটাকে শাসাল। পিটার উডককই কেবল পারে না- অ্যাক্টিং করতে আমিও পারি, ভাবল সে সন্তুষ্ট চিত্তে।

ক্রেটের সারির দিকে চেয়ে বুঝল গার্ড তার পক্ষে সবগুলো খুলে দেখা সম্ভব নয়। দু'একটা খুলেই সে রীতিমত উত্তেজিত করে ফেলেছে শেফকে। এরপর হয়তো কিল-ঘুসি মেরে বসবে। ও.কে. করে দিল। রানা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার সঙ্গীদের নিয়ে লোডিং-এ।

ক্যামেরা ছেড়ে বিনকিউলার বের করেছে রবার্ট। গলায় ক্যামেরাটা ঝুলছে। প্রথমে ছুটে যাওয়া হলুদ বেলুনটাকে দেখল সে কিছুক্ষণ। এবার সীন নদীতে ভাসমান প্রমোদ তরীগুলোর দিকে চোখ গেল ওর। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নদীতে ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হয় এই সব বোটে। ট্যুর আইফেল ভেডেট্; ছোট্ট বিরাশি সীটের কাঁচের ছাদওয়ালা জাহাজটা। টাওয়ারের কাছে পন্ট দি'য়েনা থেকে কোয়াই মন্টেবেলো পর্যন্ত যাওয়া আসা করে ওটা। 'বিউ মুচে' ছাড়ে ডান পাড়ের পন্ট দিই আলমা থেকে। এটারই খোঁজ করছিল রবার্ট, এতক্ষণে দেখতে পেয়ে একটা সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটের কোণে।

সার্ভিস এলিভেটর এসে পৌঁছল গ্যালারিতে। কাজের মানুষের ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে রানার মধ্যে। মালপত্র সব রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে সরানো হচ্ছে ট্রলিতে করে। রেস্তোরাঁয় ঢুকেই রানা লক্ষ করল এক দল ফ্রেঞ্চ টেলিভিশনের লোক ক্যামেরা লাইটিং ইত্যাদি চেক করতে ব্যস্ত। কোন একটা নিউজ আইটেম কাভার করার জন্যে এসেছে ওরা।

এখনও রেলিঙের ধারেই দাঁড়িয়ে আছে কবির চৌধুরী। তবে এখন তার পাশে রয়েছে রবার্ট। এখনও চোখ থেকে বিনকিউলার নামায়নি। টাওয়ারের প্রবেশ পথে সাংবাদিকদের ভিড়টা লক্ষ করছে সে। দেখল ব্যারিও- কিছুক্ষণ আগে সে-ও গিয়েছিল নিচে- অপেক্ষা করছে সাংবাদিকদের সঙ্গে ওপরে ওঠার জন্যে।

কবির চৌধুরী মৃদু স্বরে রবার্টকে বলল, 'সবাই জায়গা মত উপস্থিত হলে আমাকে জানিয়ো।' মিনিট পাঁচেক পর রবার্ট জানাল, 'অল প্রেজেন্ট। এইমাত্র সবাই যার যার জায়গা মত পজিশন নিয়েছে।'

পুলিস গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। আবার বিনকিউলারটা তুলে নিল রবার্ট। একটা লিমুজিন- সম্ভবত ফরাসী সরকারের সবচেয়ে ভাল আর দামী লিমুজিনটাই, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে টাওয়ারের দিকে। সামনে দু'জন সশস্ত্র পুলিস মোটর সাইকেলে লীড করছে- পিছনে আরও চারজন। ডপলার এফেক্ট অনুযায়ী সাইরেন এক পর্দা উপরে বাজছে। সাইরেন থেমে গেল। টাওয়ারের নিচে এসে থেমেছে ওরা সবাই।

গাড়ি থেকে একজন নামল। চারদিক একবার ভাল করে তদারক করে নিল সে। লোকটার কোটের নিচে বাম দিকটা যে উঁচু হয়ে ফুলে আছে তা নজর এড়াল না রবার্টের। সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট।

গাড়ির অন্য দিকের দরজা দিয়ে আর একজন এজেন্ট বের হলো। সেও তার সহকর্মীর মত সবাইকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক নজর দেখে নিল। এবারে ওরা দু'জন দু'জনের দিকে চাইল। প্রথমজন মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতেই দ্বিতীয়জন বিনীত ভাবে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। একজন লম্বা সুন্দরী মহিলা বের হলেন গাড়ি

থেকে- বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি।

রিসেপশন কমিটির চারজন অফিশিয়াল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে সামনে বাড়ল। একটা ভ্যান থেকে একজন নাদুসনুদুস ছোট্ট টাক মাথা লোক নেমে এল। সম্ভ্রান্ত অতিথির দিকে চেয়ে, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে ছোটখাট একটা বক্তৃতা আরম্ভ করল সে। ‘আজকে আপনার এই শুভ আগমনে আইফেল টাওয়ার ধন্য হয়েছে। আমরা সবাই আনন্দিত, সম্মানিত এবং কৃতজ্ঞ বোধ করছি। ফ্রান্সের শিশুদের রিলীফ ফান্ডের...’

কথার মাঝখানেই মিসেস লিনডা জোন্‌স্ বলে উঠলেন, ‘আহ্, মশিয়ে গার্ডিয়াস জেসন্। আপনার সাথে আবার মিলিত হতে পেরে, খুব খুশি হলাম। আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এতে বরং আমিই নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি।’

মশিয়ে জেসন অপ্রস্তুত ভাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল মিসেস জোনসকে। এগিয়ে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল টাওয়ারের লোকজন আর ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্‌স রিলীফ ফান্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। স্বভাবজাত আভিজাত্যের সাথেই আলাপ করলেন মিসেস জোন্‌স্ সবার সাথে। কখনও বিশুদ্ধ ফরাসীতে আবার কখনও বা ইংরেজীতে- আমেরিকার পশ্চিম উপকূলীয় অ্যাকসেন্টে।

ফরাসী নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন তাদের চিরাচরিত পন্থায় ঘিরে রেখেছে সম্মানিত অতিথিকে। মিসেস জোন্‌স্ উপরে ওঠার সময়ে তারা ভাগ হয়ে গেল। গাড়িতে যে দু’জন ছিল তারাই কেবল রইল তাঁর সাথে।

টাওয়ার রেস্তোরাঁর নিয়মিত রাঁধুনী জোসেফ। তার সুষ্ঠু নেতৃত্বে রান্নাঘরে সব সময়েই নিয়ন্ত্রিত বিশৃ^লা বিরাজ করে। সে

একেবারেই আশা করেনি আর একজন শেফ আজ তার রান্নাঘরে হামলা চালাবে। শুধু তাই না, তার সাথে আবার দশ বারো জন সহকারীও রয়েছে। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে তাকে নিচে থেকে টেলিফোন করে, 'রেস্তোরাঁ লারোজ'-এর লোকজনের আসার কথা জানানো হয়েছে। ভাল খাবার সাপ্লাই করার জন্যে ওদের নাম আছে। রীতিমত বিখ্যাত ওরা সারা ফ্রান্সে আউট সাইড কেটারিং-এর জন্যে। কিন্তু তবু তার রান্নাঘরে এসে মাতব্বরি করবে ওরা এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না জোসেফ।

আড় চোখে লক্ষ করছে জোসেফ। রান্নার খবরদারি করছে রানা। এক সময়ে ভেংচি কেটে মন্তব্য করল জোসেফ, 'ফুঁঃ, টিনের খাবার গরম করা আবার রান্না হলো?'

একলাফে জোসেফের দিকে ঘুরে দাঁড়াল রানা, 'কি বললে? টিনের খাবার গরম করছি আমি?' হাত নেড়ে সে স্টীম ওঠা বাক্সগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল, 'ডিম সেদ্ধ করতে শিখেই শেফ হয়ে গেছ? আরে গাধা, এখানে গরম নয়, রান্না করা হচ্ছে চল্লিশ পদের বিভিন্ন 'সুফ্লে অউ ক্রিভেট দিমোল।' আর এক দিকে দেখিয়ে বলল, 'আর এখানে মডিউলেটেড্ মাইক্রোওয়েভে ব্রেইজ্ করা হচ্ছে ট্রুফলে। তাও আবার ফাইন হার্বের সস ক্রনে অউ ব্যবহার করে- বুঝতে পারছ কিছু, নাকি এটুকু বিদ্যেও নেই পেটে?'

হাত দুটো চিত করে সামনে বাড়িয়ে কাঁধ দুটো উঁচিয়ে মুখ বিকৃত করল জোসেফ। একটা বাক্সে কি রান্না হচ্ছে দেখার জন্যে হাত বাড়াতেই হাতের ওপর চাঁটি খেল। 'নে তসে পাস্।' ছোট বাচ্চাকে শাসন করার মত করে ফ্রেঞ্চে জোসেফকে কিছু ছুঁতে বারণ করল রানা।

রেস্তোরাঁর ভিতরে সবাই অপেক্ষা করছে আজকের বিশেষ সম্মানিতা প্রধান অতিথির জন্যে। ফিসফিস করে ব্যারিকে কি যেন বলল কবির চৌধুরী। বাইরের করিডরে এসে ব্যারি সার্ভিস এলিভেটরটা আবার নিচে পাঠিয়ে দিল। টাওয়ারের নিচে একজন আইসক্রীমওয়ালা তার আইসক্রীমের বাক্সের ভিতর থেকে দুটো মেশিন পিস্তল বের করে একটা দিল ডেভিডের হাতে। মেশিন পিস্ত ল হাতে পেয়েই ঝড়ের বেগে ঢুকল সে টাওয়ারের গার্ড রূমে।

ডেভিডের পিস্তল দেখে গার্ড নিজের পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল। কিন্তু তার আগেই ঘাড়ের কাছে পিস্তলের বাঁটের বাড়ি খেয়ে মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল তার অচেতন দেহ। ওর অবস্থা দেখে অন্য গার্ডটা আর কোন বাহাদুরির চেষ্টা করল না। তাকে দিয়েই সার্ভিস এলিভেটরে অচেতন দেহটা বইয়ে নিয়ে উপরে ওঠার বোতাম টিপে দিল ডেভিড।

প্রধান লিফটটা এসে দাঁড়িয়েছে প্রথম লেভেলে। দরজা খুলতেই এজেন্ট দু'জন বেরিয়ে এল মিসেস জোন্‌স্‌কে পথ দেখাতে। ব্যারির অ্যামবুশটা এল অকস্মাৎ- খুবই নিষ্ঠুর আর নির্মম।

ব্যারির প্রথম লাথিটা পড়ল প্রথম এজেন্টের দুই ঊরুর সংযোগ স্থলে। দ্বিতীয়জন চট করে পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল- কিন্তু রবার্ট গোমেস ধরে ফেলল তার হাত। ব্যালে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে গেল ব্যারির শরীরটা- পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড একটা লাথি পড়ল এজেন্টটার পেটে। দু'ভাঁজ হয়ে গেল । চপটা ঘাড়ের পিছনে পড়তেই ধরাশায়ী হলো।

পিছনের রান্নাঘরে রানা তখন জোসেফকে বলছে, 'এইবার তোমার কৌতূহল মেটানোর সময় এসেছে।' একটা বড় মত

কেটারিং বাক্সের ওপর টোকা দিল সে। 'দেখো কি রান্না হয়েছে।' ঢাকনা খুলে শান্ত ভাবে নিজের লোকদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারার এম এ-২৮ মাইসনার মেশিন পিস্তল আর থমসন সাব-মেশিনগান বিলি করল রানা। বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে জোসেফের।

কবির চৌধুরীর লোকজন ইতোমধ্যেই চাদরে ঢাকা ট্রলি রেস্তোরাঁয় ঠেলে আনতে শুরু করেছে। চাদরের তলায় নানান যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র। মিসেস জোন্স্-এর সামনে এগিয়ে এল কবির চৌধুরী। 'গুড মর্নিং, মিসেস জোন্স্, আমি কবির চৌধুরী।' ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত গলায় বলল সে। 'আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আপনি আমার হাতে আটকা পড়েছেন। লক্ষ্মী মেয়ের মত ওর,' আঙুল দিয়ে রবার্ট গোমেসের দিকে দেখাল সে, 'সাথে গেলে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি আপনার কোন ক্ষতি করা হবে না।'

কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন মিসেস জোন্স্ তার দিকে। 'তুমি জানো, আমি কে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। 'যদি না জানতাম, তাহলে আপনাকে কিডন্যাপ করার জন্যে এত ঝামেলায় যেতাম না।'

কটমট করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেই বললেন, 'তুমি মনে কোরো না যে বোকার মত এই রকম একটা জঘন্য অপরাধ করে তুমি পার পেয়ে যাবে, এর মাশুল তোমাকে দিতেই হবে।' রানা মনে মনে মিসেস জোনস-এর প্রশংসা না করে পারল না। সত্যি, এঁর মধ্যে সুরুচিসম্পন্ন একটা শক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। পরনে অত্যন্ত সুন্দর দামী গাউন, পাকা চুলের গোছা ঢেউ খেলে খেলে নিচে নেমেছে। মুখে ভয়শূন্য উদ্ধত একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পাচ্ছে।

'ভি আই পি রূমেই আপনার সময় আরামের সাথে কাটবে।

রবার্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আপনাকে।' বলল কবির চৌধুরী।

'রূমটা আমি খুব ভাল করেই চিনি, তবে তুমি ওই রূমে প্রবেশ করার অধিকার কোনদিন পেয়েছ কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।' কাটা কাটা ভাবে কথাগুলো শেষ করেই ঘুরে গটমট করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন রেস্তোরাঁ থেকে ভি আই পি রূমের দিকে। রবার্ট ছুটল তাঁর পিছন পিছন।

রেস্তোরাঁর কমান্ডোরা ছড়িয়ে পড়ে সব অতিথিদের বন্দুকের ডগায় এক কোণে জড়ো করেছে। ডেভিড আর আইসক্রীম বিক্রেতা পৌঁছল টাওয়ার গার্ডদের নিয়ে।

সেকেন্ড ল্যান্ডিঙে অন্যান্য কমান্ডোরা পিস্তল দেখিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে সব দর্শকদের। একজন গার্ড দৌড়ে গেল অ্যালার্ম বোতামের দিকে। কালাসনিকভের এক ঝাঁক গুলি ওর পিঠটা ঝাঁঝরা করে দিল।

'কেউ নড়বে না!' সাবধান করে দিল টিচ একটা ব্যাটারি সেট লাউড স্পীকারে। 'কেউ হিরো হতে যেয়ো না, মারা পড়বে।'

রেস্তোরাঁর কিচেনে রানা 'মাইক্রোওয়েভ আভন পি ৭৬৯ঢ়৫২১ কুকফাস্ট' লেখা কেটারিং ক্রেটটার তালা খুলল। ডেভিডকে ডেকে দু'জনে মিলে খুব সাবধানে তুলে আনল একটা চকচকে ল্যাপ লেজার।

ওদিকে সেকেন্ড গ্যালারির রেলিঙের ধারে তিনজনে ধরাধরি করে সমান সাবধানতার সাথেই টাওয়ারের পাশ দিয়ে রূপাকে উঠিয়ে দিল একটা লোহার পাতের ওপর। রূপা ওয়েল্ডিং মাস্ক পরা। একজন একটা এসিটিলিন টর্চ আর একটা শক্ত মত লোহার ব্রাকেট এগিয়ে দিল। কাজে লেগে গেল রূপা...তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে বটে মেয়েটা।

লিন্ডা জোন্‌স্‌ ভি আই পি রূমে একটা মোটা গদিওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন, দু'হাতের আঙুল পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। আঙুলের কাঁপুনি বন্ধ রাখবার জন্যেই হয়তো। দরজাটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেছে রবার্ট। তাঁকে নিয়ে কবির চৌধুরী কি করবে কোন ধারণাই নেই তাঁর। সম্ভবত টাকা দাবি করবে তাঁর মুক্তির বিনিময়ে। তাঁর সন্দেহ হচ্ছে কবির চৌধুরী ভুল জায়গা বেছে নিয়েছে এই কাজের জন্যে। তাঁর সাথে সে-ও তো এখানে বন্দী। তাঁর মন বলছে আর চব্বিশ ঘণ্টাও আয়ু নেই তাঁর।

সেকেন্ড লেভেলের ট্যুরিস্টদের ফার্স্ট লেভেলে নিয়ে আসা হয়েছে। কবির চৌধুরী ব্যাটারি সেট লাউড স্পীকার তুলে নিল তাদের নির্দেশ দেয়ার জন্যে। 'শোনো সবাই- আমি কবির চৌধুরী বলছি, তোমাদের সবাইকে নিরাপদে মুক্তি দেয়া হবে যদি তোমরা আতঙ্কিত না হয়ে আমার নির্দেশ মেনে চলো। একটু পরেই তোমাদের ছোট ছোট দলে লিফটে করে নিচে নিয়ে যাওয়া হবে আমার লোকজনের তত্ত্বাবধানে। নিচে পৌঁছেই তোমরা টাওয়ার এলাকা ছেড়ে দ্রুত সরে যাবে। যদি না যাও কঠিন বিপদ নেমে আসবে তোমাদের ওপর। এখন সবাই লিফটের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো, যার যার পালা মত সবাইকেই নিচে পৌঁছে দেয়া হবে।'

প্রথম আর দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙের মাঝামাঝি এক জায়গায় অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে একটা বীমের ওপর বসে ওয়েল্ডিং করছে রূপা। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রথম ল্যান্ডিং থেকে দৃশ্যটা দেখে রানাকে ডাকল ডেভিড। কাছে আসতেই বলল, 'ওই যে দেখো, সুজানা কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।' এক গোছা দড়ি কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে তরতর করে লোহার কাঠামো বেয়ে উঠে গেল রানা

রূপার কাছে। দড়ি নিচে ফেলতেই ল্যাপ লেজার গানটা বেঁধে দিল ডেভিড। রানা আর রূপা দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করে রেখেছিল অন্তত একটা ল্যাপ লেজার ওরা নিচে ফেলবে। একটা নষ্ট করতে পারলেও তাদের বাধা দেয়ার কাজে কিছুটা সুবিধা হবে। ধীরে ধীরে ল্যাপ লেজার উপরে উঠছে। কবির চৌধুরীর গলা শোনা গেল লাউড স্পীকারে। 'কোন রকম ত্রুটি বিচ্যুতি সহ্য করব না কিন্তু আমি। লেজার গানের কোন ক্ষতি হলে যার যার নিজের ভুলের জন্যে তাদের ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী করা হবে। সাবধান করে দিচ্ছি আমি আগেই টিচ্, পিটার আর সুজানাকে।'

নিচে পুলিস আর লোকজনের একটা মাঝারি রকমের জটলা জমেছে। তারা সবাই বিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ করল অদ্ভুত দেখতে একটা জিনিস ধীরে ধীরে রশি দিয়ে টেনে উপরে তোলা হচ্ছে।

টিচ্ তার ব্রাকেট ওয়েল্ডিং শেষ করে দড়ি নিচে ফেলতেই দ্বিতীয় লেজার গানটা বেঁধে দিল ডেভিড। ওপরে উঠে গেল সেটাও।

ওদিকে লেপং ব্যস্ত রয়েছে তার ট্রেনিং দেয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইলেকট্রিকাল কাজে। টাওয়ারের মেইন সাপ্লাই-এর তার আর অন্যান্য আরও অনেক তার নিয়ে ওরা কাজ করছে। স্যাতো ক্লারিনটে যেমন শিখেছে ঠিক তেমনি ভাবে। স্যাতোতে একজন একটা ভুল করেছিল কিন্তু এখানে সবাই নির্ভুল ভাবেই কাজ করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ টাওয়ারের ইলেকট্রিক সাপ্লাই এসে গেল লেপং-এর নিয়ন্ত্রণে।

প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকজন দ্রুত বেরিয়ে গেল টাওয়ার এলাকা ছেড়ে। ততক্ষণে অনেক পুলিস এসে গেছে ঘটনাস্থলে। কিছু

এসেছে টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আর বাকি পুলিস এসেছে মিসেস জোনসের গার্ড এজেন্ট দু'জন রুটিন রিপোর্ট পাঠায়নি বলে। ছাড়া পাওয়া কয়েকজন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ফিরে চাইছে টাওয়ারটার দিকে। কেউ কেউ উত্তেজিত স্বরে জানাচ্ছে তাদের জান নিয়ে ফিরে আসার কথা। পুলিস অধীর ভাবে লিফটের বোতাম টিপে ধরে আছে- কিন্তু কোন কাজ হচ্ছে না। টাওয়ারে এখন পুরোপুরি তার আধিপত্য কায়েম করেছে লেপং। সে একাই এখন টাওয়ারের একক লিফটম্যান।

স্টীল হেলমেট পরা দাঙ্গা-পুলিস হাজির হলো টাওয়ারের নিচে। মুক্তিপ্রাপ্ত ট্যুরিস্টদের কাছে ঘটনা জেনে নিয়ে প্রবেশ পথের দিকে এগুলো তারা। সিঁড়িপথে ছুটল তারা ওপরের দিকে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই টের পেল যে তাদের শীল্ড তাদের রক্ষা করতে পারছে না। শীল্ড ফুটো করে গায়ে লাগছে বুলেট। ছত্র ভঙ্গ হয়ে নিচে নেমে এল ওরা। নিহত দেহগুলো সিঁড়ির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল।

গোলাগুলির শব্দে কবির চৌধুরী মেইন লিফ্টের পাশে তার পোস্ট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে এল। লাউড স্পীকারে নির্দেশ দিল সিঁড়ি রক্ষীদের, 'যত কম গোলাগুলি করে কাজ হাসিল করা যায় সে চেষ্টাই করো।'

কমান্ডোদের মধ্যে কে একজন মন্তব্য করল, 'সেটা আমাদের না বলে ওই দাঙ্গা পুলিসকে বলুন।'

মন্তব্যকারীর নাম জেনে নিল কবির চৌধুরী কমান্ডো চীফের কাছ থেকে। আদেশ দিল, 'অপারেশন শেষ হলে ওকে গুলি করবে, ওর মেরুদণ্ডে। কিন্তু সাবধান, লক্ষ রেখো যেন ও মারা না পড়ে।'

দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে টাওয়ার। টেলিভিশনের লোক ছাড়া আর সবাইকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

রানা আর রূপা তৃতীয় ল্যাপ লেজারটা তুলে ওয়েল্ডিং করে লাগিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে। ওদিকে টিচ্ চতুর্থটার ওপর কাজ করে চলেছে। সবাইকে জড়ো করল কবির চৌধুরী লেভেল ওয়ানে। রবার্টকে এক বাক্স চাকতি দিল সে সবাইকে একটা করে দেয়ার জন্যে।

'তোমরা জানো এগুলো কি,' হাঁক ছেড়ে বলল রবার্ট। 'এগুলো লেজার গান থেকে নিরাপদ থাকার ট্যাগ। আশা করি তোমাদের নতুন করে সাবধান করার দরকার নেই- কারণ তোমরা সবাই জানো এবং দেখেছ এটা সারাক্ষণ সাথে না রাখলে কি ঘটতে পারে। ল্যাপ লেজারগুলোকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সচল করা হবে। টাওয়ারের একশো গজের মধ্যে যে কোন কিছু নড়বে, তাই ধ্বংস করবে ল্যাপ লেজার যদি তার সাথে এই ট্যাগ না থাকে!'

প্রথম ট্যাগটা কবির চৌধুরীকে দিল রবার্ট। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রহণ করল সেটা কবির চৌধুরী। বুক পকেটের সাথে ওটা গেঁথে নিয়ে বলল, 'বিলি শেষ করে রেস্তোরাঁয় আমার সাথে দেখা করবে তুমি।' রেস্তোরাঁয় ঢুকল সে। যাবার আগে নিজের লোকজন সবাইকে স্নাইপিং রেঞ্জের বাইরে থাকার নির্দেশ দিল।

টাওয়ার থেকে মুক্তি পাওয়া ট্যুরিস্টদের শেষ দলটা এগিয়ে গেল পুলিস বেষ্টনীর দিকে, জনতাকে ওখানেই আটকে রেখেছে পুলিস। অজস্র মানুষের ভিড় জমেছে এখন। পুলিসের পক্ষে এই ভিড় ঠেকিয়ে রাখা রীতিমত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু আগেই মাইক্রোফোনে টাওয়ারের একশো গজের মধ্যে কাউকে আসতে নিষেধ করে ঘোষণা দিয়েছে কবির চৌধুরী; পুলিস সে

ভাবেই এখন বেষ্টনী তৈরি করেছে। সেই বেষ্টনীর ভিতরে কোন কিছুই আর নড়াচড়া করছে না। রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোন যানবাহন চলছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেস্তোরাঁয় কবির চৌধুরীকে খবর দিল লেপং, ল্যাপ লেজারগুলোকে এখন সক্রিয় করা হয়েছে। সুষ্ঠু ভাবে কাজ করছে সব কটা ল্যাপ লেজার।

'গুড,' বলল কবির চৌধুরী। রেস্তোরাঁর ভিতরে ফরাসী টেলিভিশনের কর্মীদল আর কবির চৌধুরীর লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিভিশনের কর্মীরা কল্পনাও করতে পারেনি তাদের এমন এক নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে আজ।

অনেকগুলো বৈদ্যুতিক তার আনা হয়েছে রেস্তোরাঁর মধ্যে লেপঙের নির্দেশে। এখান থেকে লাইভ্ টেলিকাস্ট করতে ওগুলো কাজে লাগবে। সান্ধ্য বাদকদের মঞ্চে এখন একটা টেলিভিশন মনিটর শোভা পাচ্ছে। রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিল কবির চৌধুরী। সবই তার প্ল্যান অনুযায়ী এগোচ্ছে। নিউজের ক্যামেরাম্যানদের ডাকল কবির চৌধুরী। কন্টিনেন্টাল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মত এরাও পুরানো জিনিস ছেড়ে আজকাল ই.এন.জি. (ইলেকট্রনিক নিউজ গ্যাদারিং) ব্যবহার করছে।

'তোমরা ই.এন.জি. ক্যামেরা ব্যবহার করে আমার নির্দেশ মত ফরাসী টেলিভিশনে সরাসরি এখানকার দৃশ্য দেখাবে। ঠিক আছে?' সম্মতি চাইল কবির চৌধুরী টিভি কর্মীদের।

'অবশ্যই- পাঁচশোবার।' জবাব দিল চীফ ক্যামেরাম্যান। একটু যেন বেশি উৎসাহ লোকটার। ভয়ে? না নাম কিনবার আশায়?

'আমার কথা মত না চললে কি ঘটবে সেটা নিশ্চয়ই নতুন

করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না স্যার, আমার দুঃসাহসী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। আপনার কথামতই সব কাজ হবে। শুধু কি করতে হবে আদেশ করুন।'

মনে মনে খুশিই হলো কবির চৌধুরী। মুখে বলল, 'ঠিক আছে- প্রস্তুত হও তবে।'

'স্যার, কি করতে হবে আমাকে আগে একটু বুঝিয়ে দিন।'

'আমি সারা দুনিয়াকে জানাতে চাই যে আইফেল টাওয়ার দখল করে নিয়েছি আমি, আর জিম্মি রেখেছি মার্কিন প্রেসিডেন্টের মাকে। আর কিছু জানবার আছে তোমার?' প্রশ্ন করল কবির চৌধুরী।

'না, স্যার। আমি সব ব্যবস্থা করছি।' ত্বরিত জবাব দিল টি ভি ক্যামেরাম্যান। ব্যাপারটা বুঝে গেছে সে। মরে যাওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

আট

রূম সার্ভিসকে অর্ডার দিল সোহানা ৮১২ নম্বর কামরায় একটা ওমলেট আর কফি দিয়ে যাওয়ার জন্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সার্ভ করে গেল রূম সার্ভিসের ওয়েটার।

আজ সারা সকাল ধরে চেষ্টা করেও কাজে একটুও এগোতে পারেননি রাহাত খান। ইন্টারপোল, সি.আই.এ. বা ইউনাকো মনিটর কেউই কোন নতুন খবর দিতে পারেনি।

সোহানা মাত্র ওমলেটের বড় সড় একটা টুকরো মুখের কাছে এনে হাঁ করছে অমনি টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছুরি কাঁটা প্লেটে রেখে ছুটল সে টেলিফোন ধরতে।

টেলিফোনে কথা শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। এক ফাঁকে হাতের ডান পাশে রাখা টেলিভিশন সেটটা অন করে দিল সে।

'ঠিক আছে, আমরা অ্যামব্যাসাডরের সাথে যোগাযোগ করছি।' বলে ফোন ছেড়ে দিল সোহানা।

মেজর জেনারেল রাহাত খান তাঁর কাঁচা পাকা ভুরু তুলে তাকালেন সোহানার দিকে।

'অসম্ভব কাণ্ড করে বসেছে কবির চৌধুরী!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সোহানা। 'আইফেল টাওয়ার হাইজ্যাক করেছে সে!'

'আইফেল টাওয়ার হাইজ্যাক?' খেপে উঠলেন রাহাত খান। পুরো ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকছে তাঁর কাছে।

'হ্যাঁ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে আইফেল টাওয়ার দখল তো করেছেই- একজনকে জিম্মিও রেখেছে,' বলল সোহানা।

'কাকে?' রাহাত খানের কপাল কুঁচকে উঠেছে উত্তেজনায়।

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের মা লিণ্ডা জোনসকে।'

'গুড হেভেনস্। কাগজে দেখেছি, আজ সকালে একটা পার্টি ছিল আইফেল টাওয়ারে, ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ফান্ডের জন্যে চ্যারিটি পার্টি।' চিন্তিত হয়ে পড়লেন রাহাত খান।

'টেলিভিশনে নাকি কি জরুরী ঘোষণা হবে, ইনটিরিয়র

মিনিস্ট্রি থেকে বলল।' বিড়ালের মত তখন ঘড়-ঘড় শব্দ তুলছে টেলিভিশন। সেটটা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহানা।

একটু পরেই ঘোষকের ছবি ভেসে এল টিভির পর্দায়- 'একটি বিশেষ ঘোষণার জন্যে আমরা আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছি। বিশেষ ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করুন।'

এক মিনিট অন্তর অন্তর বার তিনেক এই রকম ঘোষণার পরে হঠাৎ পর্দায় ভেসে উঠল কবির চৌধুরীর মুখ। 'দুঃখিত,' আরম্ভ করল কবির চৌধুরী, 'আপনাদের নিয়মিত প্রোগ্রামে আমি বিঘ্ন ঘটাতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার ধারণা, আপনারা এখন যা দেখবেন তা আপনাদের চিরাচরিত প্রোগ্রামের চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য হবে।' কথাগুলো প্রথমে ফরাসী ভাষায় বলল কবির চৌধুরী। তারপর ইংরেজীতেও সে আবার ওই একই কথা বলল।

'আমার নাম কবির চৌধুরী। আমি একটু আগে আইফেল টাওয়ার দখল করে নিয়েছি। না, ঠাট্টা করছি না- নিজের চোখেই দেখুন আপনারা।' অন্য একটা ক্যামেরাতে সুইচ করা হলো- ক্যামেরা প্রথমে এক নম্বর ল্যান্ডিঙের সশস্ত্র কমান্ডোদের দেখাল, পরে গিয়ে স্থির হলো বিমূঢ় রায়ট পুলিস, পুলিস কর্ডন আর জনতার ভিড়ের উপর। লেজার গানগুলো ক্যামেরায় দেখানো হলো না একবারও।

'আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটুও মিথ্যে বলছি না।' আবার কবির চৌধুরীর মুখ দেখা গেল পর্দায়। 'আর হ্যাঁ, এটাই সব নয়- আমার এখানে একজন আটক আছেন- জিম্মিও বলতে পারেন ইচ্ছে করলে। ফরাসী ও মার্কিন সরকার যদি আমার দাবি মেনে নেয় তাহলে জিম্মির কোন ক্ষতি করা হবে না।' একটা

হাতে-ধরা ই.এন.জি. ক্যামেরায় ভি.আই.পি. রূম ধরা পড়ল। দেখা গেল দৃঢ় চেহারার এক বদ্ধা বসে আছেন চেয়ারে। জুম করে শুধু মুখটা ধরে থাকল ক্যামেরা।

'হ্যাঁ, অনেকে হয়তো চেহারা দেখেই চিনেছেন- ইনিই মার্কিন প্রেসিডেন্টের মা লিন্ডা জোনস।' একটু থেমে আবার শুরু করল কবির চৌধুরী, 'নিজের চোখেই সব দেখলেন। এর কোনটাই মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়। আমি ও আমার সঙ্গীরা এই টাওয়ারের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করেছি। কিভাবে কর্তৃত্ব করছি তা একটু পরেই দেখতে পাবেন। আইফেল টাওয়ার দখল করে আমার জিম্মিকে নিয়ে আমি এইখানেই বসে থাকব যতক্ষণ না আমাকে মুক্তিপণ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হচ্ছে।

'ফ্রান্সের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই- তবে এত খেটে বুদ্ধি খরচ করে আইফেল টাওয়ার দখল করেছি, এটাকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার জন্যে...আমি বলব, তিরিশ মিলিয়ন ডলার খুবই যুক্তিসঙ্গত দাবি। আমার এই অপারেশনের খরচাটা তাতে উঠে যাবে। কিন্তু মিসেস লিন্ডা জোনসের মুক্তির ব্যাপারে আমার কিছুটা বক্তব্য আছে। আমেরিকার কাছে আমার আগেরই পাওনা আছে দশ বিলিয়ন ডলার। আর মিসেস জোনসের মুক্তির জন্যে আমি দাবি করছি আরও দশ বিলিয়ন- অর্থাৎ মোট বিশ বিলিয়ন ডলার আমার চাই। আমার কাছ থেকে দশ বিলিয়ন ডলার দিয়ে রাডার ইকুইপমেন্ট কিনেছিল মার্কিন সরকার। টাকা দেওয়া দূরের কথা- উপরন্তু আমার গবেষণাগার ধ্বংস করা হয়েছিল। বিশ্ববাসীর আজানা নেই কিভাবে যুদ্ধ জাহাজ আইওয়ায় চড়ে গোটা আমেরিকা ধ্বংসস্তূপ বানাতে গিয়েছিলাম আমি কামান দেগে। যে কারণেই হোক আমার সেই মিশন সফল হয়নি- কিন্তু সেজন্যে

এখন আমি আর দুঃখিত নই। আমার ন্যায্য পাওনা এখন আমি কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিতে চাই। যদি আমার পাওনা টাকা না দেয়া হয় তবে চরম অপমান করব আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের। তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্টের মা অসহায় ভাবে মারা পড়বেন আমার হাতে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। সোহানা উঠে গেল টেলিফোন ধরতে। কিছুক্ষণ ওদিককার কথা শোনার পর জবাব দিল সে, 'আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে মিস্টার অ্যামব্যাসাডর- টেলিভিশনে শেষ পর্যন্ত কি বলা হয় তা না শুনে উনি টেলিফোন ধরতে পারবেন না।' টেলিফোন রিসিভার নিচে শুইয়ে রেখে আবার টেলিভিশনে মনোযোগ দিল সোহানা। কবির চৌধুরী বলছে, 'এবার দেখুন কেন আমার বিরুদ্ধে মিলিটারি বা সিভিল কোন শক্তি প্রয়োগেই কোন ফল হবে না।' কবির চৌধুরীর মুখ মিলিয়ে গেল স্ক্রীন থেকে- ক্যামেরা টাওয়ারের বাইরের অংশের ওপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে নাটকীয় ভাবে উপরে উঠতে লাগল ক্যামেরা- প্রথম ল্যান্ডিং ছাড়িয়ে আরও উঠে একটা ল্যাপ লেজারের ওপর এসে থামল। ওটার বদখৎ চেহারা দেখে যে কেউ নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারবে ওটা সাংঘাতিক কিছু একটা। কবির চৌধুরী বলে চলল, 'আপনারা এখন যা দেখছেন, তা একটা ল্যাপ লেজার গান। এই রকম চারটে গান আছে আমাদের।

'এই গানগুলো, মানে ল্যাপ লেজার সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ওদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ধার নিয়েছি আমি এগুলো, ওদের স্টুটগার্ট বেস থেকে। সম্ভবত এগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। প্রত্যেকটাই এখন এমন ভাবে সক্রিয় করা হয়েছে যে

আইফেল টাওয়ারের একশো গজের মধ্যে যা কিছু নড় ক না কেন তা সে মাটিতেই হোক বা আকাশেই, অবস্থান নির্ণয় করে এই লেজার গান সেটাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেবে। ফরাসী সরকার, পুলিস ও সেনাবাহিনীকে আমি তাদের ভালর জন্যেই এই উপদেশ দেব তারা যেন এই অস্ত্রের বিরুদ্ধে যুঝতে চেষ্টা না করেন। এক ঘণ্টা পরে আমি আবার আপনাদের সামনে হাজির হব- এখনকার মত বিদায়।' পর্দা সাদা হয়ে গেল।

ওয়াশিংটন, লন্ডন, মস্কো, টোকিও, কায়রো, ব্রাসেলস, উপগ্রহের মাধ্যমে সবখানেই টেলিভিশনে ধরা পড়েছে কবির চৌধুরীর ঘোষণা। টেলেক্স আর ডিপ্লোমেটিক তারবার্তা চলতে শুরু করেছে দেশে দেশে। শঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে প্যারিসে- পৃথিবীর বড় বড় সব শহরে রাস্তাঘাট খালি হয়ে গেল, আশঙ্কায় অস্থির হয়ে সবাই বসে আছে টিভি সেটের সামনে।

টেলিফোন ধরলেন রাহাত খান, 'টেলিভিশনে কি বলল শুনেছ, এরিক?' ওদিক থেকে কিছু বলার আগেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, পুরোটাই দেখলাম- কিন্তু কি করা যায় কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।' উত্তেজনায় কাঁপছে অ্যামব্যাসাডরের গলা। 'এর সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি আমি।'

'এই কবির চৌধুরী সম্পর্কে বিরাট ফাইল আছে আমাদের ইউনাকো অফিসে। দুর্ধর্ষ লোক। সে যাই হোক- ওই ল্যাপ লেজার গানগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আপদ। ওগুলোর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই কিছুটা জানা আছে? বর্তমান অবস্থায় পুলিস বা আর্মির কিছুই করবার নেই।'

'ইন্টিরিয়র মিনিস্টারের সাথে যোগাযোগ করছি আমি- তুমিও যদি দয়া করে আসো তবে ভাল হয়।'

‘আসছি আমি, কিন্তু তার আগে যোগাযোগ করছি আমি হোয়াইট হাউসের সাথে।’ টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। নামিয়ে রাখার প্রায় সাথে সাথেই আবার বেজে উঠল সেটা।

‘রাহাত খান বলছি।’

‘ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চান- লাইন দেব?’ বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল টেলিফোন অপারেটার।

‘অবশ্যই,’ জবাব দিলেন মেজর জেনারেল। রাহাত খানের সাথে প্রেসিডেন্টের বেশ ভাল জানোশোনা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বন্ধুত্ব।

প্রেসিডেন্টের ভারী গলা শোনা গেল টেলিফোনে, ‘সোজা কাজের কথায় আসছি- লিনডা জোন্‌স ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় অতিথি- আপনাকে তো রেড্‌ প্রায়োরিটি আগেই দেয়া আছে- এখন এব্যাপারে আমি আপনাকেই ফ্রান্সের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে বলছি। আমি ডিফেন্স, হোম আর ফরেন মিনিস্টার সবাইকে খবরটা দিচ্ছি- ওরা সব রকম সহযোগিতা করবে।’

‘ঠিক আছে।’

‘আপনি দায়িত্ব নিলে কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব আমি।’

‘তবে একটা কথা, ওদের কাছে ল্যাপ লেজার গান রয়েছে- আমাদের শেষ পর্যন্ত হয়তো টাকা দিয়ে নিষ্পত্তি করতে হতে পারে।’

‘সে আপনি যা ভাল বোঝেন তা-ই করবেন। পুরো দায়িত্ব এখন থেকে আপনার, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই সব হবে। আর আপনার সম্মতির জন্যে অজস্র ধন্যবাদ।’ ফোন ছেড়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

‘মেজর জেনারেল রাহাত খান বলছি।’ সোহানার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে বললেন তিনি। তাঁর নির্দেশে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস বুক করেছিল সোহানা।

‘হ্যালো, প্রেসিডেন্ট জোনস।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারী গলা শোনা গেল।

‘খবর শুনেছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

‘হ্যাঁ, এইমাত্র রেকর্ড করা টেপ দেখানো হলো সারা আমেরিকায়।’

‘কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?’ প্রশ্ন করলেন মেজর জেনারেল।

‘আমার করার কিছুই নেই। কবির চৌধুরীর চাহিদা মেটাবার মত অত টাকা আমি কোথায় পাব? সিনেট জরুরী মীটিঙে বসছে আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওরা কি সিদ্ধান্ত নেয় সেটা ওদের ওপর নির্ভর করছে।’

‘ঠিক আছে, ঘণ্টা খানেক পরে আবার যোগাযোগ করব আমি-এখনকার মত বিদায়।’ ফোন ছেড়ে দিলেন রাহাত খান।

‘রেডি হয়ে নাও। এখনই বেরোতে হবে।’ সোহানার দিকে চেয়ে বললেন মেজর জেনারেল।

ঘটনা যা-ই হোক না কেন বাচ্চাকে সবচেয়ে সামনে রাখা মানুষের স্বভাব। সবাই চায় বাচ্চাও উপভোগ করুক পুরোপুরি। টাওয়ারের নিচের ভিড়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

বাচ্চাটার বয়স সাত হবে। দু’দিকে দুটো পুলিসের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছে। তার সোনালী চুল গোছা করে ফিতে দিয়ে বাঁধা। হাতে একটা বড় সাদা-কালো চেকের বীচ বল। মা দুই হাতে ওর কাঁধ খামচে ধরে রেখেছে।

যদিও মজার কিছু তার নজরে পড়ছে না তবু তার দৃষ্টি আর মনোযোগ টাওয়ারের ওপর স্থিরভাবে আটকে রয়েছে। একসময় আশপাশে মনোযোগ ধরে রাখার মত কিছু না পেয়ে বল নিয়ে খেলায় মন দিল বাচ্চাটা। বলটাকে জোরে মাটিতে ড্রপ দিয়ে ধরতে গেল আবার। কিন্তু তার হাঁটুতে লেগে বলটা গড়গড়িয়ে চলে গেল সামনে চক দিয়ে চিহ্নিত টাওয়ারের সীমা রেখার দিকে। এক ঝটকায় কাঁধ ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটল সে বলের পিছনে। চিৎকার করে উঠে মা-ও ছুটল তার পিছু পিছু, কিন্তু বাধা দিল পুলিস। কয়েক ফুট দূরে ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা টেকো হোঁতকা মত লোক পুলিসকে ঠেলে সরিয়ে ছুটল মেয়েটার পিছনে।

টাওয়ারের ওপর একটা ল্যাপ লেজারকে একটু বাম দিকে হেলতে দেখা গেল। ইঁদুরের কানের মত অ্যানটেনা আর একটু উঁচু হলো। ছুটন্ত মানুষ আর বলের সাথে সাথে লেজার গানও নড়ছে ধীরে ধীরে। কমপিউটর সবচেয়ে কাছের ছোট জিনিসটাই প্রথম টারগেট হিসাবে বেছে নিল।

দাগের কাছাকাছি চলে গেছে তখন মেয়েটা। ছুটতে ছুটতেই ডাইভ দিল টেকো। ধরে ফেলেছে সে ছোট মেয়েটার পা ঠিক দাগের একফুট বাইরে। আজই সকালে কবির চৌধুরীর নির্দেশে দাগ দিয়ে গেছে তার কমান্ডোদের কয়েকজন।

দাগ পেরিয়ে গেল বলটা। বিদ্যুৎ বেগে কাজ করল ল্যাপ লেজার। নিকষ কালো এক ঝলক আলো দেখা গেল টিউবের মাথায়। বলের আকৃতিটা উজ্জ্বল সাদা রূপ নিল মুহূর্তের জন্যে। একটু ধোঁয়া উঠে গেল ওপরের দিকে। তারপর কোন চিহ্ন মাত্র আর নেই।

মেয়েকে বুকের মধ্যে ঠেসে ধরে মা তখন আবেগে

ফোঁপাচ্ছে। কেমন একটা ভয়ানক স্তব্ধতা নেমে এসেছে ভিড়ের মাঝে। অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য দেখে সবাই স্তম্ভিত বিমূঢ়।

লিমুজিন্‌টা এসে থামল ইনটিরিয়র মিনিস্ট্রি ভবনের সামনে। গাড়ি থেকে নামতেই রাহাত খান আর সোহানাকে নিয়ে যাওয়া হলো কন্‌ফারেন্স রূমে। তিনজন মিনিস্টারসহ বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা জড়ো হয়েছে- পুলিস, আর্মি, এয়ারফোর্স, সিভিল ডিফেন্স, কোনটাই বাদ নেই- প্রত্যেক বিভাগের প্রধানই স্বয়ং উপস্থিত।

ইন্টিরিয়র মিনিস্টার মশিয়ে পম্পেদু মেজর জেনারেলের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

চকচকে ওভাল টেবিল ঘিরে বসে আছে সবাই। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে মুখ খুললেন ডিফেন্স মিনিস্টার লারু। 'আমার বিশ্বাস এই লোকটা সম্বন্ধে যতটা সম্ভব আমরা সবাই যদি জানতে পারি তাহলে আমাদের কাজের অনেক সহায়তা হবে। মেজর জেনারেল রাহাত খানকে আমি অনুরোধ করব এই বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে।'

'কবির চৌধুরীই সম্ভবত এই যুগের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল,' শুরু করলেন বদ্ধ। 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এত বড় প্রতিভা আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। মিসগাইডেড জিনিয়াস বলা যেতে পারে তাকে। ক্ষমতার লোভ আর বিজ্ঞান সাধনার নেশায় সে একটার পর একটা ক্রাইম করে চলেছে। প্রচুর টাকা আছে তার- আর প্রচুর ব্যয়ও করে সে তার এক্সপেরিমেন্টের পিছনে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বেশ কয়েকবার সাফল্যের সাথে তার সাংঘাতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ করেছে। আমি এটুকু বলতে

পারি, কবির চৌধুরী যদি কোন দাবি করে বসে তবে তার সে দাবি এড়িয়ে যাওয়া যতটা সম্ভব কঠিন করে তুলবে সে।'

'আপনি কি বলতে চান আমাদের সব সময়ে সে চাপের মধ্যে রাখবে- নড়া চড়া করার সুযোগই দেবে না?' প্রশ্ন করলেন মশিয়ে লারু।

'ঠিক তাই,' জবাব দিলেন রাহাত খান। 'ধরে নিচ্ছি যে কথাটা এই চার দেয়ালের বাইরে যাবে না- ইউনাকোর দুজন টপ্ এজেন্টকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এই লোকটার দলে। খুব একটা আশা করা ঠিক হবে না- ওরা কতদূর কি করতে পেরেছে বা পারবে কিছুই আমাদের জানা নেই; কারণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। চোখ কান খোলা রেখে অপেক্ষা করা ছাড়া এই মুহূর্তে আমাদের কিছুই করণীয় নেই।' বক্তব্য শেষ করলেন রাহাত খান।

যারা তাকে ঘিরে রয়েছে তাদের খুঁটিয়ে লক্ষ করল ডেভিড। সুজানার দুঃসাহসিকতার জন্যে তাকেই লীডার নির্বাচিত করা হয়েছে। বাকি কয়েকজন কমান্ডো তার কথামত কাজ করবে। টেবিলের ওপর টাওয়ারের একটা প্ল্যান বিছানো। পঁচিশ পাউন্ডের চারটে চার্জ ওই প্ল্যানের চার কোণে পেপার ওয়েটের কাজ করছে।

ডেভিডের আঙুল প্ল্যানের চারটে জায়গা নির্দেশ করল, এটা, 'এটা, এটা আর এটা- এগুলো হচ্ছে টাওয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এই বিন্দুগুলোই টাওয়ারের সবচেয়ে দুর্বল স্থান। এগুলো উড়িয়ে দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে গোটা আইফেল টাওয়ার।'

'প্রতিটি জায়গাতেই কি একটা করে পঁচিশ পাউন্ড চার্জ বসাতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রূপা।

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড, ‘হ্যাঁ প্রত্যেক পয়েন্টে এক একটা পঁচিশ পাউন্ডের চার্জ বসাতে হবে।’ স্টীলের বাক্স থেকে একটা ডেটোনেটর বের করে নিল সে। ‘সাথে এগুলো একটা। রেডিও অ্যাকটিভেটেড ডেটোনেটর। যতক্ষণ না রেডিও সিগনাল দিয়ে অ্যাকটিভেট করা হচ্ছে ততক্ষণ সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু একবার সিগনাল দেয়া হলে নির্ধারিত সময়ে ওটা ফুটবেই- কোন উপায় থাকবে না ফেরানোর।’

কাজের সময়ে দেখা গেল দুজন কমান্ডো গার্ড রেলের পাশে একটা স্ট্রাটের ওপর বসে রীতিমত ঠকঠক করে কাঁপছে। অত উঁচুতে কোন মতেই কাজ করতে পারবে না ওরা। বিরক্ত হয়ে টিচ্ কনুইয়ের গুঁতোয় একজনকে তার পথ থেকে সরিয়ে অন্যজনকে হিঁচড়ে টেনে গার্ড রেলের ওপর বসিয়ে দিল। তারপর টাওয়ারের পাশ দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে দুটো বিস্ফোরক চার্জ বসানোর কাজ আরম্ভ করল। রূপা আর তৃতীয় কমান্ডো ধরল বাকি দুটোর কাজ।

আগের মতই সহজ সাবলীল দ্রুতগতিতে কাজ করে চলেছে রূপা। একটা অ্যাঙ্গল স্ট্রাটের ওপর বসে নরম গোলাপী রঙের প্লাস্টিক রোল গার্ডারের খাঁজে বসিয়ে টেপ দিয়ে আটকাল, তারপর ডেটোনেটরটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে।

উপরে দাঁড়ানো সহকর্মী কমান্ডোর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে একটু হাসল রূপা। হয়তো ভয় পাচ্ছে লোকটা- তবু সহযোগিতা করছে। রূপাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল সে। অসহিষ্ণু ভাবে হাতটা সরিয়ে দিয়ে রূপা বলল, ‘আমার কথা ভাবতে হবে না- নিজে সাবধান থাকো তুমি।’

একটু আহত ভাবেই হাত সরিয়ে নিল লোকটা। তারপর

ক্রসবীম ধরে এগিয়ে গেল সে। স্পাইরাল সিঁড়ির কাছাকাছি পর্যন্ত ক্রসবীমটা গেছে। সিঁড়ির গার্ড রেল ধরার জন্যে লাফ দিল। কিন্তু না, মিস করেছে! চিৎকার করে উঠল সে ভয়ে। পা দিয়ে তখন একটা বীম জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে লোকটা।

লোহার ধারাল প্রান্ত হাঁটুর পিছনদিকের নরম জায়গায় কেটে বসেছে। যন্ত্রণায় পা সোজা হয়ে গেল ওর। দ্বিতীয়বার চিৎকার দিয়ে বীম ছেড়ে নিচের দিকে পড়তে শুরু করল। একটা অ্যাঙ্গেল স্ট্রাটের সাথে বাড়ি খেল। রূপার পাশ দিয়েই নিচে পড়ছে সে এখন। একহাতে শক্ত করে একটা স্ট্রাট ধরে অন্য হাতে কমান্ডোর হাতটা ধরে ফেলল রূপা ঠিক কব্জির একটু উপরে। রোমান হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে সেও আঁকড়ে ধরেছে রূপার কব্জির উপরের অংশ। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রূপা- তার মনে হলো যেন কাঁধটা দেহ থেকে খুলে যেতে চাইছে- কিন্তু ছাড়ল না সে। দাঁতে দাঁত ঘষে আঁকড়ে ধরেই রইল।

টিচ্ ওদিক থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'একটু ধরে রাখো- আমি আসছি।'

রূপার শক্তি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বুঝতে পারছে যে আর বেশিক্ষণ তার পক্ষে ওকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। দাঁতে দাঁত চেপে লোকটাকে বলল, 'একটা গার্ডারের ওপর পা তোলার চেষ্টা করো।' ঝুলন্ত লোকটা বৃথাই শূন্যে পা ছুঁড়ল কয়েকবার। আর পারছে না রূপা। 'সারাদিন ধরে রাখতে পারব না আমি- একটা কিছু করো।' অস্থির হয়ে উঠেছে রূপা। জড়িয়ে ধরা স্ট্রাটটা মনে হচ্ছে কেটে বসে যাচ্ছে পেশীর মধ্যে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। প্রচণ্ড চাপে ধীরে ধীরে স্ট্রাট থেকে ফসকে যাচ্ছে তার আঙুল। বীমের ওপর রূপার দেহটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে

আসছে। আর সহ্য করতে পারছে না। মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তস্বর বেরিয়ে এল তার।

তারপর সব শেষ। সমস্ত উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিমেষে মিলিয়ে গেল। নিচ থেকে টিচ্ জাপটে ধরেছে ঝুলন্ত লোকটাকে। প্রায় ফস্কে গেছিল স্ট্রাট থেকে রূপার হাত- চট করে নিজেকে সামলে নিল সে। বিশালকায় টিচ্ অনায়াসে লোকটাকে শূন্যে তুলে রূপার পাশে বসিয়ে দিল।

'কি খবর তোমার?' উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল রূপা।

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে একদৃষ্টে নিচের দিকে চেয়ে আছে সে। একটু পরে বলল, 'অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে- বিরাট একটা ফাঁড়া কেটেছে।'

একটা চাঁটি কষাল টিচ্ ওর মাথায়। খেপে গেছে সে। 'কুত্তার বাচ্চা- ফাঁড়া কেটেছে? আমি হলে ঠিকই ছেড়ে দিতাম তোকে, মরণই তোর উপযুক্ত শাস্তি।' কানটা জোরে মুচড়ে দিয়ে আবার বলল, 'যা ভাগ্- চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা। এরপরে আবার আমার সামনে পড়লে লাথি মেরেই তোকে নিচে ফেলব!'

টাওয়ারের তলায় রানা, লেপং আর ব্যারি কাজ করছে। লারোজ ট্রাকগুলোকে সরিয়ে বৃত্তাকারে রেখেছে ওরা রেড ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে ওয়াগনগুলো যেভাবে সাজানো হত, অনেকটা তেমনি ভাবে। প্রত্যেক ট্রাক থেকে মোটা তারের স্পূল খুলতে খুলতে ওরা আন্ডার গ্রাউন্ড চেম্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল। টাওয়ারের প্রধান ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইনের সাথে একটা একটা করে তার জুড়ে দিল লেপং। অতি সাবধানে।

এখন যদি ওরা টাওয়ারের ইলেকট্রিক সাপ্লাই বন্ধও করে দেয় কিছু ক্ষতি হবে না। জেনারেটর ট্রাকগুলো থেকে শুধু ল্যাপ লেজার

নয়, গোটা টাওয়ার শক্তির জোগান পাবে। কপালের ঘাম মুছল লেপং। কাজ করতে করতে প্রচুর ঘেমেছে সে। বিয়ারের ট্যাঙ্কে চোখ পড়তেই ওদিকে এগিয়ে গেল। হাতল ঘোরাতেই হিস্‌স্‌ করে শব্দ উঠল। কমপ্রেসড্‌ এয়ার!

'বাহ্‌, প্রচুর গ্যাস আছে তো তোমাদের বিয়ারে, ব্যারি?' হাসিমুখে মন্তব্য করল লেপং। শব্দে ঘুরে তাকিয়েছিল ব্যারি। ধমকে উঠল, 'ওগুলো ধোরো না- বিয়ার চাও, ওপরে রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাও।'

বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ কলল রানা। বিয়ার ট্যাঙ্কে অক্সিজেন! মতলবটা কি কবির চৌধুরীর?

ইনটিরিয়ার মিনিস্ট্রিতে কাজ অনেক নিয়ন্ত্রিত ভাবে চলেছে এখন। ফালতু কথা বলে আর সময় নষ্ট করছে না কেউ। সমরাস্ত্র বিশেষজ্ঞ আর কয়েকজন পদার্থ বিজ্ঞানীকে ডাকা হয়েছে; লেজার গানের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সে বিষয়ে জোর গবেষণা চলছে। সবার মাথাতেই এখন ওই এক চিন্তা- লেজার গানকে ঠেকাতে হবে।

'লাইট বীম দিয়ে কাজ করে ল্যাপ লেজার- এক কাজ করলে হয় না, আয়না ব্যবহার করে রে-টাকে আমরা ওদের বিরুদ্ধেই তো ব্যবহার করতে পারি?' উপস্থিত পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন প্রস্তাব দিল। একটু আশার আলো যেন দেখা যাচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে মেজর জেনারেল বললেন, 'আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটা ভাল মনে হলেও বাস্তবে পরিণত করায় কতগুলো অসুবিধে আছে।'

'কেন কি অসুবিধে?' জানতে চাইল প্রস্তাব দাতা।

স্পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই যে আয়নার ওপর পুরোপুরি লম্বভাবে কোন রশ্মি পড়লেই কেবল আলোটা যে পথে এসেছিল ঠিক সেই পথে ফেরত যাবে- অর্থাৎ লেজার গানে গিয়ে হিট করবে। কিন্তু আয়নাটা যদি থিটা ডিগ্রী এদিক ওদিক হয় তাহলে কি ঘটবে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

সাথে সাথেই জবাব এল, 'তাহলে দুই থিটা ডিগ্রী সরে যাবে আলোটা।'

'ঠিক তাই,' সমর্থন করলেন মেজর জেনারেল। 'আমাদের পক্ষে ঠিক নব্বই ডিগ্রী কোণ বজায় রেখে ল্যাপ লেজারের আওতায় আয়না নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়- তাই রিফ্লেকটেড বীম অ্যাপ্রোচিং অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী টাওয়ারের যে কোন জায়গায় গিয়ে লাগতে পারে।'

একজন টেলিভিশন অন করে দিয়ে বলল, 'আমাদের নতুন টিভি স্টারের আবার পর্দায় আসার সময় হয়ে এল।'

ঘড়ি দেখল সোহানা- আর একমিনিট বাকি। সবার চোখ টেলিভিশনের ওপর। সরকারী নির্দেশাবলীর ঘোষণা শেষ হওয়ার সুযোগ দিল কবির চৌধুরী। ঘোষকের মুখটা মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল তার মুখ।

'এখন সকাল দশটা,' গম্ভীর মুখে শুরু করল সে। 'আজ রাত দশটা পর্যন্ত আমি সময় দিচ্ছি তোমাদের। এই সময়ের মধ্যে আমার দাবি মত সব টাকা আমি চাই। ফরাসী সরকারের তিরিশ মিলিয়ন আমি চাই ক্যাশ ডলারে এই টাওয়ারে রাত দশটার মধ্যে। আর মার্কিন সরকারের বিশ বিলিয়ন আমি আজকের মধ্যেই সুইস ব্যাঙ্কে, K- 523, এই অ্যাকাউন্টে জমা চাই। আমি টেলিফোনে খবর নিয়ে জানব জমা হয়েছে কি হয়নি। ঠিক রাত দশটায় আমি

আমার সঙ্গীদের নিয়ে টাওয়ার ছেড়ে চলে যাব। ল্যাপ লেজারগুলো আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। আমরা টাওয়ার ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই চারটে বিস্ফোরণ ঘটবে এক সাথে। মাটির সাথে মিশে যাবে আইফেল টাওয়ার।

'আমি নিশ্চিত যে তোমরা কেউ চাও না এমনটা ঘটুক। মার্কিন সরকার যদি আমার দাবি মেটাতে অক্ষম হয় তাহলে, বিস্ফোরণের সময় মিসেস জোনস টাওয়ারেই থাকবেন। আমার বিশ্বাস মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্যে খবরটা খুব প্রীতিকর হবে না, জনসাধারণও এটাকে তাদের জাতীয় অমর্যাদা হিসেবে গণ্য করবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ঘটনার ভয়াবহতা দর্শকদের পুরোপুরি উপলব্ধি করার সুযোগ দিল কবির চৌধুরী।

এবারে ট্রাম্প কার্ডটা খেলল সে। 'লিনডা জোনসের মুখেই শোনা যাক তাঁর বক্তব্য।' ধীরে ধীরে ক্যামেরাটা বাঁ দিকে ঘুরে কবির চৌধুরীর পাশে বসা মিসেস জোনসের উপর স্থির হলো।

'তুমি কি মনে করো আমি নিজের জীবন ভিক্ষা চেয়ে তোমার অন্যায় দাবি মেনে নিতে বলব ওদের? কক্ষনো না!'

'আপনি কি বলেন না বলেন তাতে আমার মোটেও কিছু আসে যায় না।' এই বলে ক্যামেরার ভিউ থেকে হেঁটে বেরিয়ে গেল কবির চৌধুরী। 'যা খুশি বলুন।'

ক্যামেরার দিকে মুখ ঘোরালেন লিনডা জোনস।

'আইফেল টাওয়ারের মুক্তিপণ যদি কেউ দিতে চায় তবে সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি অনুরোধ করছি, আমার এখানে উপস্থিতি যেন গ্রাহ্যের মধ্যে না আনা হয়। আইফেল টাওয়ারের মত আমিও পৃথিবীর বুকে অনেকদিন ধরে আছি। হয়তো আমাদের দুজনেরই প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

‘আমাকে আইফেল টাওয়ারের সাথে নিলামে চড়তে হবে এই অর্ধ উন্মাদ দাম্ভিক বদমায়েশটার জন্যে- এটা এই বুড়ো বয়সে আমার জন্যে যেমন লজ্জাকর তেমনি জঘন্য। ওর কথা মেনো না তোমরা- ওকে ধ্বংস করো। তোমাদের সাথে একই আলো বাতাস উপভোগ করে বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই ওর মত লোকের। তোমাদের কষ্টার্জিত টাকা যদি দিতেই হয় তবে ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স রিলীফ ফান্ডে দিয়ো। ওদের সাহায্যের প্রয়োজন আছে- কবির চৌধুরীর নেই।’

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেছে মার্কিন অ্যামব্যাসাডর- এরিক সমারস্। বুকটা তার ফুলে উঠেছে গর্বে। এই না হলে প্রেসিডেন্টের মা!

ক্যামেরা সরে দ্রুত ফিরে গেল কবির চৌধুরীর উপর। রাগে মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার। ‘এই বেপরোয়া বোকা বুড়িটা যাই বলুক না কেন- মনে রেখো, তোমাদের সময় সীমা মাত্র বারো ঘণ্টা। গুড বাই।’

নয়

অস্থির ভাবে পায়চারি করছে কবির চৌধুরী টাওয়ারের রেস্তোরাঁয়। প্রত্যেক অপারেশনেই এই সময়টা তার সবচেয়ে অসহ্য বলে মনে হয়। এই যে অপেক্ষা...ওদিকে প্রতিপক্ষ কত তর্ক-বিতর্ক আর জল্পনা-কল্পনা চালাচ্ছে কিভাবে তাকে ঠকিয়ে নিজেদের টাকা বাঁচাবে। ব্যস্ত ওরা। কিন্তু তার করার আর কিছুই নেই। ভাবল,

চশমাটা ফিট করতে হবে এবার।

একটা গ্লাসে নিজের জন্যে কনিয়াক ঢেলে নিল কবির চৌধুরী। এক ঢোকে গিলে নিয়ে হাতের ইশারায় ব্যারিকে ডাকল। 'আমাদের এখন আরও সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে।'

'অস্ত্রের কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল ব্যারি।

'ঠিকই ধরেছ।' মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। 'তবে কৌশলে কাজ করতে হবে। তোমাকে ঠিক যেমন যেমন বলেছিলাম।'

একটু পরেই মাইকে ঘোষণা করে দিল ব্যারি, 'সবাই যার যার অস্ত্র সহ রেস্তোরাঁয় রিপোর্ট করো।'

সবাই এসে পৌঁছলে কবির চৌধুরী বেশ জাঁকের সঙ্গে বলল, 'রক্তপাত আমি মোটেও পছন্দ করি না, আর অনাবশ্যক দুর্ঘটনাকে আমি দেখি ঘৃণার চোখে। ল্যাপ লেজার চালু রয়েছে, কাজেই ওসব বিপজ্জনক জিনিস তোমাদের এখন আর সঙ্গে না রাখলেও চলবে। সবার অস্ত্র জমা নিয়ে আমি দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়িয়ে যেতে চাই।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল ঘরের মধ্যে। সবাই অসন্তুষ্ট। বিশেষ করে টিচ্ মোটেই ভাল চোখে দেখছে না ব্যাপারটা। রবার্ট ও ব্যারির উদ্যত অস্ত্রের মুখে একে একে সবাই সুবোধ বালকের মত কবির চৌধুরীর সামনে টেবিলে জমা দিল নিজেদের অস্ত্র।

নিজের এ. কে ৪৭ অটোমেটিক রাইফেল আর এম এ ২৮ মাইস্নার মেশিন পিস্তল জমা দেয়ার সময়ে রূপা জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কি অবিশ্বাস করা হচ্ছে?'

'বিন্দু মাত্র না,' চোখ কপালে তুলল কবির চৌধুরী। 'শুধু মাত্র ভুল চুক, দুর্ঘটনা, ঝুঁকি ইত্যাদির সম্ভাবনা কমানোর জন্যেই এ ব্যবস্থা।'

'রবার্ট আর ব্যারির অস্ত্র তো জমা নেয়া হলো না?' প্রশ্ন করল

ডেভিড।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল কবির চৌধুরী। 'কিছু মানুষকে তো সশস্ত্র থাকতেই হবে, ডেভিড,' জবাব দিল সে। 'বিশেষ করে আমার আর আমার অনেক দিনের চেনা লোকজনের কাছে অস্ত্র থাকাই তো ভাল!'

রানা আর ডেভিড সমস্বরে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। লেপং ধরল ফোন। তারপরেই উত্তেজিত স্বরে কবির চৌধুরীকে বলল, 'ইনটিরিয়র মিনিস্টার পম্পেদু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন, স্যার।'

সাফল্যের হাসি ফুটল কবির চৌধুরীর মুখে, 'এত জলদি আশা করিনি, তবে আমি জানতাম রাজি ওদের হতেই হবে।'

মশিয়ে পম্পেদু সোজাসুজি জানালেন, কবির চৌধুরীর দাবি নিয়ে দর কষাকষি করার ইচ্ছে তাঁর নেই।

'চমৎকার,' বলল কবির চৌধুরী। 'এত তাড়াতাড়ি সুমতি হয়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। আর কিছু বলার আছে?'

খুক করে একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন মশিয়ে পম্পেদু, 'ফাইনান্স মিনিস্টার জানিয়েছেন এত টাকা এক সাথে জড়ো করা বা গোণা এত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তিনি আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন সময় সীমা আরও আট ঘণ্টা বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে।'

হাসি মিলিয়ে গেল কবির চৌধুরীর। 'অসম্ভব!' ধমকে উঠল সে, 'বলটা যখন আমার কোর্টে ছিল, আমি আমার মত খেলেছি। এখন বল আপনাদের কোর্টে- আপনারা কিভাবে খেলবেন সেটা আপনাদের ইচ্ছে। আজ রাত ঠিক দশটায় আমি আমার লোকজন নিয়ে টাওয়ার ছেড়ে চলে যাব। টাকা জোগাড় হলে আমার কাছে

আবার টেলিফোন করবেন, তার আগে নয়।’

টেলিফোনের আলাপ লাউড স্পীকারে রিলে হচ্ছে কনফারেন্স রূমে। মশিয়ে পম্পেদু মেজর জেনারেল রাহাত খানের দিকে চাইলেন জিজ্ঞাসু চোখে। একটা কাগজে কি যেন লিখে এগিয়ে দিলেন তিনি।

‘আসলেই ফ্রান্সের এই মুহূর্তে নগদ তিরিশ মিলিয়ন ডলার নেই। আমাদের অন্য কোন দেশ থেকে ডলার এনে আপনার চাহিদা পূরণ করতে হবে। সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর…’

বাধা দিল কবির চৌধুরী, ‘ওসব বাজে অজুহাতে কিছুটা সময় হাতে পাওয়ার বৃথা চেষ্টা করবেন না। সরাসরি আমেরিকা থেকে ডলার আনলেও প্লেনে আট ঘণ্টার বেশি লাগতে পারে না। আজ রাত দশটার মধ্যে টাকা আমার চাই।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল কবির চৌধুরী।

স্পারা গেল না, মেজর জেনারেল, ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করছে কবির চৌধুরী।’ ফোনটা নামিয়ে রেখে মন্তব্য করলেন মশিয়ে পম্পেদু।

সময় বাড়াতে মোটেই রাজি নয় কবির চৌধুরী। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না- টাওয়ার ছেড়ে পালাবে কিভাবে সে?

এরিক সমারস্‌কে অনেকক্ষণ নিচু গলায় কিছু নির্দেশ দিলেন রাহাত খান। একটু আগেই টেলিফোনে জেনেছেন, সিনেট বসেছে, মীটিং চলছে- কোন সিদ্ধান্তে এখনও পৌঁছতে পারেনি তারা।

নির্দেশ অনুযায়ী টাওয়ারের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন সমারস্‌।

‘অ্যামব্যাসাডর এরিক সমারস্‌ বলছি। কবির চৌধুরীর সাথে

কথা বলতে চাই।'

'একটু ধরুন- লাইন দিচ্ছি তাঁর ওখানে,' বলল লেপং।

'কবির চৌধুরী বলছি,' কবির চৌধুরীর গলা শোনা গেল।

'এরিক সমারস্,' জবাব দিলেন অ্যামব্যাসাডর।

'কি খবর, মিস্টার জোনস রাজি হয়েছেন আমার প্রস্তাবে?'

'ওঁর অত টাকা কোথায় যে উনি রাজি হবেন?' নম্রভাবে বললেন রাষ্ট্রদূত।

'সে কথা তো আমি জানতে চাই না- মিসেস জোনস্ মারা পড়া মানে প্রত্যেকটা আমেরিকানের অপমান। সিনেট মীটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিক তারা। পাবলিক ফান্ড থেকে এই টাকা দেবে- নাকি তারা তাদের প্রেসিডেন্টের মাকে হারাবে? কোনটা বড় তাদের কাছে, টাকা না ইজ্জত?'

'এই মুহূর্তে সিনেটের মীটিং চলছে, কিন্তু তারা যদি টাকা দিতে রাজিও হয় তবু আপনি যে সময় দিচ্ছেন তার মধ্যে টাকা পৌঁছানো অসম্ভব। এত টাকা ইউ.এস. কারেন্সিতে জোগাড় করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আজকে পাঁচটা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক খোলা থাকছে, এত কিছু এইটুকু সময়ের মধ্যে করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সময় সীমা কিছুটা বাড়াতেই হবে আপনাকে। অন্তত আগামীকাল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। সম্ভব-অসম্ভব বলেও তো একটা কথা আছে?'

পুরো আধ মিনিট সময় নিল কবির চৌধুরী জবাব দিতে।

'আমার পক্ষে সময় বাড়ানো সম্ভব নয়- দরকার হয় ব্যাঙ্কের কাছে সময় নিন। মার্কিন সরকারের অনুরোধ নিশ্চয়ই ফেলবে না সুইস ব্যাঙ্ক- বিশেষত টাকার অঙ্ক যখন শুনবে, তখন না বলবে না ওরা।' নিজের কথায় অটল রইল কবির চৌধুরী। 'এটা একটা

জরুরী অবস্থা। দরকার হয় রাত দশটা পর্যন্ত খোলা রাখবে ওরা ব্যাঙ্ক।'

একটা কাগজে কি যেন লিখে বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান। কাগজটা দেখে নিয়ে অ্যামব্যাসাডর আবার বললেন, 'দেখুন এ-ব্যাপারে আপনার অজানা কিছু নেই, এসব কাজে সময় লাগে তা আপনি নিশ্চয়ই...'

কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে কবির চৌধুরী বলে উঠল, 'রাত দশটা- দুঃখিত, ওটাই আমার শেষ কথা।' টেলিফোন ছেড়ে দিল সে।

প্রথম গ্যালারির রেলিঙ ঘেঁষে হাঁটছে রূপা আপন মনে। থামল খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নেয়ার জন্যে। উল্টোদিক থেকে ডেভিড এসে হাজির হলো। রূপার পাশে রেলিঙে ভর দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। তারপর খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে মন্তব্য করল, 'তোমার মত সুন্দরী মেয়েকে কিন্তু এই কাজে ঠিক মানায় না, সুজানা।'

বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল রূপার। এইবার কি তার কোপটা বসাবে ডেভিড? এখনও সময় আছে, সব রকম যোগাযোগহীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে একেবারে...?

জোর করে তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল রূপা, 'ধন্যবাদ, ডেভিড। সবসময়ে এই কাজ করিও না আমি।'

সিগারেট টানতে টানতে অলস দৃষ্টিতে শহরের শোভা দেখছে ডেভিড। 'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা। একটা মজার ব্যাপার...মানে...আমি...' কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন ডেভিড।

ভিতরটা ক্রমশ শুকিয়ে আসছে রূপার উৎকণ্ঠায়।

'তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মধ্যে কেমন একটা অনুভূতির যেন সৃষ্টি হচ্ছে, কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছি না সেটাকে।'

'অনুভূতি!' সাবধান রূপা, খুব সাবধান! মাথা ঠাণ্ডা রাখো, নইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে, ভাবল সে।

'কেন জানি আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে,' রূপার দিকে চেয়ে একটু অর্থ-পূর্ণ হাসি হেসে বলল ডেভিড। 'কোথায় দেখে থাকতে পারি বলো তো?'

'হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না যে এর আগে কোথাও পরিচয় হয়েছিল আমাদের। সার্কাসে দেখে থাকতে পারো। এমনও হতে পারে- মানে, আমি কিছু দিন মডেলিঙও করেছিলাম। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে আমার ছবি-টবি ছাপা হয়েছে অনেক- হতে পারে সে জন্যেই চেনাচেনা ঠেকছে।' খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রূপা ডেভিডের উপর। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে।

'হ্যাঁ, একথা ঠিক, আমাদের পরিচয় হয়নি আগে- হলে তোমার মত রূপসী মেয়েকে নিশ্চয়ই আমার মনে থাকত,' বলল ডেভিড। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে রূপার দিকে।

একটু লাল হয়ে ধন্যবাদ জানাল রূপা প্রশংসার জন্যে।

টাওয়ারের নিচে গিজগিজে ভিড়ের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ সোজা হয়ে গেল ডেভিড। আঙুল দিয়ে দেখাল সে, 'ওই দেখো মেরিনরা এসে পৌঁচেছে।'

রূপাও দেখল মিলিটারি ট্রাকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে, হুড়মুড় করে সৈন্য বের হয়ে আসছে ট্রাক থেকে।

'কি মনে হয় তোমার, আমাদের বিপদ হবে?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল ডেভিড। 'মনে হয় না।' এক মুহূর্ত পরে সে আবার বলল, 'আচ্ছা, পরীক্ষা করেই দেখা যাক আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন কাজ করছে।'

টোকা মেরে সিগারেটের টুকরোটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল সে। দু'হাতও যায়নি- উপর থেকে কালো একটা রেখার মত দেখা গেল- ভস্ম হয়ে গেছে সিগারেটের টুকরাটা।

নিঃশব্দ পায়ে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যারি, টের পায়নি ডেভিড। কাঁধে টোকা দিতেই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভাল,' মাতব্বরি চালে নসিহত করল ব্যারি, 'বেশি সিগারেট খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।'

পশ্চিম আকাশে হেলে পড়া নিস্তেজ সূর্যের গোলাপী আভা এসে পড়েছে টাওয়ারের ওপর। মিলিটারি তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে এখন। একশো গজ সীমারেখার গজ তিরিশেক দূরে বালির বস্তার পিছনে সৈনিকেরা সবাই প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। পুরো টাওয়ারটাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা। রাহাত খানের কাছ থেকে জেনারেলরা এর বেশি কিছু করার অনুমতি পায়নি। অবস্থান নেয়া সৈনিক এবং টাওয়ারের চারপাশের দাগের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পুলিস কমিউনিকেশন ভ্যান। নানা যন্ত্রপাতি জুড়ে সেটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা যোগাযোগ কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এখান থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খান যে কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন- মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও। ইন্টিরিয়র মিনিস্ট্রির কনফারেন্স রূম থেকে এখানে সরে আসাটা রাহাত খানের ইচ্ছেতেই হয়েছে। কাছাকাছি থাকলে রানা বা রূপার পক্ষে তাঁর সাথে যোগাযোগ করাটা হয়তো

সহজ হবে।

পুলিসের একজন পদস্থ কর্মকর্তা ভ্যানের দরজায় টোকা দিয়ে প্যারিস সিটি ইঞ্জিনিয়ারস ডিপার্টমেন্টের একজন প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। আইফেল টাওয়ারের বিস্ত ারিত ম্যাপ নিয়ে বসল সে।

সূর্য ডুবুডুবু প্রায়। গোধূলি বেলার রক্তিমাভায় কেমন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে যেন আইফেল টাওয়ার। একটা ছায়া নড়ে উঠল সিঁড়ির পিছন দিকে। অস্পষ্ট একটা শব্দ কানে এল, কিছু যেন বাড়ি খেল লোহার ফ্রেমের সাথে। একটা গার্ডারের সাথে সেঁটে গেল রানা।

বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে সোহানা আইফেল টাওয়ারের দিকে। রাহাত খানও একই ভাবে চেষ্টা করছেন রানা বা রূপাকে খুঁজে বের করতে। 'কিছু পেলে?' বিনকিউলারটা না নামিয়েই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'নাহ্, কিছু চোখে পড়ছে না।' হতাশ কণ্ঠে জবাব দিল সোহানা।

ওদিকে নিরাপদে আবার নড়াচড়া করা যাবে মনে করে বেরিয়ে এল রানা। একটু একটু করে সরতে সরতে ভ্যানটার মুখোমুখি এসে গেল সে। ভ্যানের মধ্যে রাহাত খানকে আগেই চিনেছে রানা। কি করণীয় তা বলে দিতে হয় না রানা বা রূপাকে। কিন্তু ব্যারির দৃষ্টি এড়িয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বের হওয়াই কঠিন কাজ। টয়লেটে যাওয়ার নাম করে জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে রানা। বুক পকেটের কাছ থেকে ট্যাগটা খুলে নিয়ে নিজের সামনে ধরল সে। টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে এখনও দিনশেষের সামান্য আলো এসে পড়ছে টাওয়ারে। চকচকে ধাতুর

পাতটা নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে রানা। মনে মনে চাইছে যেন পাতের ওপর ঠিকরে পড়া রোদের ঝিলিক ওদের নজরে পড়ে।

সোহানার চোখেই প্রথম ধরা পড়ল একটা ঝিলিক। উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওই যে, সেকেন্ড ল্যান্ডিং-এর ঠিক নিচে একটা ঝিলিক দেখলাম। খুব সম্ভব যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে রানা।'

'কোথায়?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। বিনকিউলার দিয়ে সেকেন্ড ল্যান্ডিং চষে ফেলছেন তিনি।

'ছোট্ট সিঁড়িটার উল্টো দিকে- বড় খুঁটিটার পাশে।'

'দেখেছি। শিগ্গির প্যাড্টা নাও- সিগনালে মেসেজ পাঠাচ্ছে রানা। জলদি!' প্রায় ধমকে উঠলেন মেজর জেনারেল।

'লেখো,' আদেশ দিলেন তিনি।

দ্রুত হাতে লিখছে সোহানা।...অসম্ভব কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা... মিসেস জোনস এখনও অক্ষত। কবির চৌধুরী আর তার নিজস্ব লোকজন ছাড়া বাকি সবাই নিরস্ত্র।

সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই রানার মেসেজ পাঠানো শেষ হলো। রুদ্ধশ্বাসে পড়ল সোহানা। কবির চৌধুরীর পালাবার প্ল্যান জানা যায়নি- কিন্তু ট্রেনিঙে একোয়া লাং থেকে শুরু করে দড়ির ওপর হাঁটা সবই প্র্যাকটিস হয়েছে- ছয় সীটের একটা হেলিকপ্টার আছে স্যাতোয়। থামল সোহানা।

'আর কি?' মেজর জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন।

'আর নেই- মেসেজ এখানেই শেষ।'

'মেসেজটা কেমন যেন খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ শেষ হলো- কোন বিপদে পড়েনি তো রানা?'

একটা হাত তখন রানার মুখ চেপে ধরেছে, তারপর টেনে নিয়ে গেছে ওকে একটা খুঁটির আড়ালে ছায়ায়। ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলল ডেভিড, 'কোন শব্দ কোরো না!'

চোখ তুলে তাকাল রানা ওপরের দিকে। ব্যারি নামছে সিঁড়ি দিয়ে। হাতে একটা টর্চ। ওদের থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে থামল সে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল কমিউনিকেশন ভ্যানটার দিকে। তারপর শ্রাগ করে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেকেন্ড ল্যান্ডিঙে পৌঁছে লিফটে করে রেস্তোরাঁয় ফিরে গেল। পিটারকে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে ব্যারি। হঠাৎ খেয়াল করল ডেভিডকেও সে অনেকক্ষণ দেখেনি। সুজানাকেও না।

রানার মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'স্বয়ং যীশু আমাকে পাঠিয়েছিলেন তোমাকে সাবধান করার জন্যে।' ঠিক সেই সময় একটা প্রচণ্ড জুডো চপ্ পড়ল ডেভিডের ঘাড়ের পাশে। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বের হলো ডেভিডের মুখ থেকে- টলতে শুরু করল সে, ওই অবস্থাতেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। ওর ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রূপা তখন আর একটা চপ মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

কিন্তু তার আগেই দ্রুত নেমে আসা রূপার হাতটা চট করে ঠেকিয়ে দিল রানা। 'মেরো না ওকে। এইমাত্র ও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।'

আটকানো দমটা ছাড়ল রূপা। 'তাহলে শোধবোধ হয়ে গেল- তুমিও এইমাত্র ওকে প্রাণে বাঁচালে।'

ক্লিষ্ট মুখে ঘাড় ডলতে ডলতে বলল ডেভিড, 'সেই সময় তো এত ক্ষিপ্র দেখিনি তোমাকে, রূপা! আমি সি আই এ ছেড়ে চলে

যাওয়ার পর খালি হাতে ফাইটের কোর্সটা তোমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে দেখতে পাচ্ছি!'

'হুঁ, তাহলে ঠিকই চিনতে পেরেছিলে আমাকে!'

'তোমাকে একবার দেখার পর,' বলল ডেভিড, 'কেউ কোনদিন ভুলতে পারে?'

'কার পক্ষ নিয়ে কাজ করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিজের এবং দেশের। তোমাদের সাথেও আছি, তোমাদের অজান্তে। মেসেজের কোন উত্তর পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সে রানাকে।

'না, সময় ছিল না।'

'তাহলে যা করার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে- বাইরে থেকে কোন সাহায্য আমরা পাব না।'

'কোন প্ল্যান আছে তোমার?' প্রশ্ন করল রূপা।

'হ্যাঁ, মোটামুটি একটা প্ল্যান আমার আছে- কিন্তু এখন সেটা বলার সময় নেই। আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পথে দ্রুত রেস্তোরাঁয় হাজির না হলে এখনই লোকজন নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে ব্যারি।'

ব্যারি ছাড়া আর কেউ ওদের রেস্তোরাঁয় ফিরে যাওয়া খেয়াল করল না। কবির চৌধুরীকে নিজের সন্দেহের কথা বলেনি ও। ওদের একে একে ঢুকতে দেখে কটমট করে চেয়ে রইল সে। ডেভিড আর লেপং তাস নিয়ে বসল। সুজানা একটা বই নিয়ে, আর পিটার উডকক একটা হাতাওয়ালা চেয়ারে বসে ভান করল ঘুমোনোর। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। রবার্ট আর ব্যারিকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কবির চৌধুরী। দশ মিনিট পরে হাই তুলে উঠে

দাঁড়িয়ে রানা ঘোষণা করল, আরাম করে একটু শোওয়া যায় এমন জায়গা খুঁজতে যাচ্ছে সে। ব্যাপারটাকে আমল দিল না কেউ।

লিফটে চড়ে সোজা সেকেন্ড ল্যান্ডিঙে চলে এল রানা। সেকেন্ড গ্যালারির রুটিন পেট্রলের দুজনকে পার হয়ে সামনে এগোল সে। ওদের অস্ত্রও জমা নেয়া হয়েছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট করার আর সতর্ক থাকার নির্দেশ আছে ওদের ওপর। মনে মনে হিসেব করল রানা ওদের দুজনের আবার একই জায়গায় ফিরে আসতে মিনিট তিনেক লাগবে।

ঠিক সময় মতই ফিরে এল ওরা। রানার লুকিয়ে নিয়ে আসা দড়িটার পাশ দিয়েই কি বলতে বলতে চলে গেল দুজন। দড়িটা ঝুলছে ফার্স্ট লেভেল পর্যন্ত। কিন্তু এমন জায়গায় সেটা বেঁধেছে রানা যে রেলিং থেকে কেউ ঝুঁকে পড়ে দেখার চেষ্টা না করলে ওটা কারও চোখে পড়বে না। তর তর করে দড়ি বেয়ে প্রাইমারী লেভেলে নেমে এল সে। ঝুলন্ত অবস্থাতেই একটু একটু করে ভি আই পি রূমের দিকে এগিয়ে গেল।

জানালার আর রানার লেভেল এক হতেই দেখল, গম্ভীর মুখে বসে আছেন বদ্ধা চেয়ারে। জানালায় টোকা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাবে, তখনই দেখল মিসেস জোনসের ঠোঁট নড়ছে! কার সাথে যেন কথা বলছেন তিনি।

একটু কাৎ হতেই দেখতে পেল কবির চৌধুরীকে। জানালার দিকেই এগিয়ে আসছে সে। মিসেস জোনসের দিকে তাকিয়ে আছে বলে রানাকে দেখতে পায়নি। হিম হয়ে গেল রানার রক্ত- আর একটু হলেই পণ্ড হয়েছিল সব! দড়ি সহ ঝট করে জানালার পাশ থেকে সরে গেল সে। সরে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মিসেস জোনসের চোখ পড়ল রানার দিকে- চোখাচোখি হলো-

কিন্তু চেহারায় বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না তাঁর। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কবির চৌধুরীর দিকে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

'আপনাকে এ কথাটা বোঝাতে পারলে ভাল হত যে আপনার একটা অনুরোধে অনেক রক্তপাত আমরা এড়িয়ে যেতে পারি আর আমাদের ঝামেলাও অনেক কমে যায়। আমি আপনাকে কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছি না- শুধু টেলিভিশনে বা টেলিফোনে একটু বললেই কাজ হবে।'

সিধে হয়ে বসলেন মিসেস জোনস। 'নিজের জীবনের জন্যে এ ধরনের ওকালতি করব এ আমি চিন্তাও করতে পারি না। আমার সন্তান আজ যুক্তরাষ্ট্রের যোগ্য প্রেসিডেন্ট। তোমার জন্যে নিজেকে আমি সবার চোখে হেয় করতে পারি না। টাকা পাওয়াটাই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সেটা পেতে হবে তোমার নিজের চেষ্টায়- আমার সহযোগিতায় নয়। এটাই আমার শেষ কথা।'

'আমি কিন্তু খুব শক্ত হতেও জানি।' হুমকি দিল কবির চৌধুরী।

সহজ ভাবেই হেসে ফেললেন বদ্ধা। বললেন, 'থাম স্ক্রু? কিংবা আয়রন মেইডেন? নাকি চাইনিজ বুট- কিংবা পানি দিয়ে নির্যাতন? আমার বয়স অনেক হয়েছে- ওসবের ভয় আর আমার নেই। ভয় যদি দেখাতেই চাও, তোমার নিজের বয়সী কাউকে খুঁজে নাও। আমার কাছে ওসব দেখাতে এসো না।'

একটা গার্ডারের পিছনে আশ্রয় নিয়েছে রানা। হাত দুটোকে কিছুটা বিশ্রাম দেওয়াই ওর প্রধান উদ্দেশ্য এখন। বিকেল থেকেই খেয়াল করেছে রানা, সন্ধ্যার পর ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে। বাতাসের বেগ কিছুটা বেড়েছে এখন। কিন্তু সেদিকে লক্ষ করার

সময় নেই রানার- মাথায় তার এখন অন্য চিন্তা। বাতাসে দড়িটা বাড়ি খাচ্ছে ভি আই পি রূমের বাইরের দেয়ালে।

দড়ির শব্দে কবির চৌধুরীর মাথাটা একটু ঘুরল- জানালার দিকে তাকাল সে। মিসেস জোনসও শুনেছেন শব্দটা- তাড়াতাড়ি কবির চৌধুরীর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার জন্যে তিনি বললেন, 'আমাদের কথা শেষ হয়েছে- এবারে তুমি বিদায় হও। একজন বন্দীরও এতটুকু স্বাধীনতা নিশ্চয়ই আছে। আর বিরক্ত না করে একটু শান্তিতে থাকতে দাও আমাকে।'

বাইরের শব্দটাকে কোন গুরুত্ব দিল না কবির চৌধুরী। কিছুক্ষণ মিসেস জোনসের কঠোর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর মৃদু হেসে মাথা নিচু করে ব্যঙ্গ ভরে কুর্নিশ করল সে। 'মাদাম, আমি বুঝতে পারছি কেন আপনার ছেলে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তবে এ-কথাটাও মনে রাখবেন যা চাই তা আমি ঠিকই আদায় করব।' গটমট করে বেরিয়ে গেল কবির চৌধুরী।

পুরো দুই মিনিট ঠায় বসে রইলেন লিন্ডা জোনস নিজের চেয়ারে। আর মনে প্রাণে চাইলেন জানালার ধারের লোকটাও যেন একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। যা সন্দেহ করেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এসে কাঁচের দরজা দিয়ে উঁকি দিল কবির চৌধুরী। প্রথমে লিনডা জোনসকে দেখল- পরে জানালার দিকে চেয়ে রইল। মিসেস জোনস বুঝতে পারছেন যে তাঁকে পিছন থেকে লক্ষ করা হচ্ছে- কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকলেন তিনি। পুরো দেড় মিনিট জানালার দিকে চেয়ে থেকে শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল কবির চৌধুরী।

মাঝে একবার উঁকি দিয়ে দরজায় কবির চৌধুরীর মুখ দেখেছে রানা। একটা গার্ডারের সাথে সেঁটে রয়েছে সে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, অবশেষে ফল মিলল।

কবির চৌধুরী চলে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন লিন্ডা জোনস। উঠে এসে জানালাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভি আই পি রুমে ঢুকল রানা।

লোহার সিঁড়িটা বিভিন্ন ভাবে ঘুরে ফিরে ওপরে উঠে গেছে। আসলে প্রথম আর দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ওটা। অনেকক্ষণ রানাকে না দেখে লিফটে করে দ্বিতীয় ল্যান্ডিঙের দিকে রওনা হলো ব্যারি। ওর কাঁধে ঝুলছে কালাসনিকভ রাইফেলটা।

গ্যালারিটা পুরো ঘুরে দেখল সে। গার্ড দুজনের সাথে আলাপ করল কিছুক্ষণ। ওদের সতর্ক থাকতে বলল। ভুরু কুঁচকে রুটিন রাউন্ডে চলে গেল গার্ডরা। রেলের কাছে এসে ঝুঁকে নিচের দিকে চাইল ব্যারি। অন্ধকার হলেও, প্রথম ল্যান্ডিঙের আলো আর ওই মিলিটারি ক্যাম্পে খুঁটির মাথায় বেশ কয়েকটা আর্কল্যাম্প ঝোলানো হয়েছে- সেগুলোর আলোয় মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে সে। দাগের বাইরে একটা বৈদ্যুতিক বেড়া বসানো হয়েছে, লক্ষ করল।

আপন মনেই হাসল সে- কিন্তু ঝুলন্ত একটা দড়ির আছড়ে পড়ার শব্দে হাসিটা মিলিয়ে গেল তার ঠোঁট থেকে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল ব্যারি। রাইফেলের সেফটি ক্যাচ অফ করে দিয়েছে সে আগেই। এক হাতে রেলিং ধরে হাতড়ে নিচে নামছে, আর মনে মনে নিজেকে গাল দিচ্ছে, বুদ্ধি করে টর্চটা কেন

যে আনেনি! দড়িটা পুরো দেখতে পাচ্ছে সে এখন। একবার দূরে সরে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার বাতাসের বেগে আছড়ে পড়ছে টাওয়ারের ওপর। দ্রুত নিচে নামছে সে। ভি আই পি রূমের জানালায় একটা ছায়া মূর্তি দেখা গেল। রাইফেল তাক করে ট্রিগার টিপতে গিয়ে তার খেয়াল হলো গুলি ছুঁড়ে কোন লাভ নেই। টার্গেটে পৌঁছবার আগেই ল্যাপ লেজার ধ্বংস করে ফেলবে গুলি, সতর্ক হয়ে যাবে শত্রু। রাইফেলটা একপাশে নামিয়ে রেখে সন্ত র্পণে নিচে নামতে শুরু করল ব্যারি।

ভি আই পি রূমের জানালা গলে বাইরে বেরোল রানা। লিন্ডা জোনসকে পিঠে নিয়ে নিচে নামতে হলে আশপাশে কেউ আছে কিনা তা দেখে নেয়া দরকার। পড়বি তো পড় বাঘের মুখে! হঠাৎ দেখল পাঁচ হাত দূরেই দাঁত বের করে হাসছে গালকাটা ব্যারি!

সাভাতে ফাইটারের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে ব্যারি। 'ভেনেয্, ভেনেয্,' হিসহিসিয়ে উঠল সে, 'আয়! আজ তোকে লাথি মেরে-মেরেই খতম করব।'

সিঁড়ির প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে নামল রানা। স্যাতোতে কয়েকবারই দেখিয়েছে ব্যারি সাভাতে ফাইটিঙে তার কতখানি দক্ষতা আর চাতুরী! একটা লাথি ঠিক মত লাগাতে পারলেই ছিটকে নিচে পড়বে রানা।

সাভাতে স্টাইলে পা দুটো ফুট দেড়েক ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে ব্যারি। একটু সামনে ঝুঁকে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে সে রানার দিকে, খুব সাবধানে। রানা দাঁড়িয়েছে জুডোর ভঙ্গিতে ব্যারির দিকে পাশ ফিরে- আঘাত করার লক্ষ্য যতটা ছোট করা যায় ততই ভাল। সামান্য একটু তেরছা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যারিও-

হাত দুটো তার শরীরের সাথে তিরিশ ডিগ্রী কোণ করে দুপাশে নেমে এসেছে, হাতের আঙুলগুলো সোজা অবস্থায় খোলা। সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে সে লাফিয়ে লাথি মারার জন্যে- সাভাতে মারপিটের বিশেষত্বই এটা।

নিকষ কালো অন্ধকার রাত। প্রথম ল্যান্ডিং আর নিচের আর্ক ল্যাম্প থেকে সামান্য আলো শুধু এসে পড়েছে জায়গাটায়। হঠাৎ করেই প্রথম লাথিটা এসে পড়ল রানার ডান হাতের বগলের কাছে। মনে হলো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে বাড়ি মেরেছে যেন কেউ তাকে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রানা। লাফিয়ে আবার প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে পরের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে তৈরি হলো। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। চোখেমুখে উড়ে এসে পড়ছে চুল, দু'হাতে সরাচ্ছে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। চারদিক থেকে যেন শয়তান আক্রমণ করেছে ওকে আর দু'হাতে ও ঠেকাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু না, সাক্ষাৎ শয়তান একটাই- রানার ঠিক সামনেই নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে আবার। সুযোগ খুঁজছে সে মোক্ষম লাথিটা মারার। ঠিক মত লাগাতে পারলে উড়ে গিয়ে পড়বে রানা টাওয়ারের নিচে।

ডান হাতটা ডলতে ডলতে তৈরি হলো রানা। কপাল গুণেই যেন বেঁচে গেছে সে প্রথম বার। পেট লক্ষ্য করে মেরেছিল ও। না বুঝেই অনুমানে বসে পড়েছিল ও।

এবারে আক্রমণটা এল রানার হাঁটু লক্ষ্য করে। হাঁটুই ব্যারির সবচেয়ে কাছে। পা ভাঁজ করে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে রানা। দেহটাকে ভাঁজ করে প্রশ্নবোধকচিহ্নের মত করে ফেলল ব্যারি। সরু পথটা ছেড়ে তার পা নয় ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে। দেহটাকে অদ্ভুত কায়দায় সরু ব্রিজটার সাথে সমান্তরাল করেই ঝাড়ল প্রচণ্ড লাথি।

এবার প্রস্তুত ছিল রানা। কোথায় মারবে আগেই আন্দাজ করেছিল সে। লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়েই সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুডো চপ মারল ঊরু লক্ষ্য করে।

কিন্তু ব্যারির পা আর এখন ওখানে নেই। শূন্যের ওপরই ডিগবাজি খেয়েছে সে- এখন তার অন্য পা আঘাত করল রানার হাঁটুর নিচে। প্রথম লাথির মত জোর নেই এতে- জায়গাটা নীল হয়ে গেল শুধু।

আবার দক্ষ জিমনাস্টের মত শরীরটা মুচড়ে ফেলল ব্যারি। দু'পা একই সাথে পড়ল প্ল্যাটফর্মে- নিখুঁত ভাবে সুষম। ছুটে গেল রানা ওর দিকে- পাঁজর লক্ষ্য করে চালাল লাথি। হো হো করে হেসে অদ্ভুত কায়দায় ব্যাক সমারসল্ট দিয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল ব্যারি। দেহটা নাচছে তার মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর বিখ্যাত প্রজাপতি নাচের মত।

ব্যারির তুখোড় দক্ষতার সামনে নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, অসহায় মনে হলো রানার। মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করবার চেষ্টা করল সে ভাবনাটা, কিন্তু পারল না। বুঝতে পেরেছে আন-আর্মড কমব্যাটে ব্যারির কাছে সে দুগ্ধপোষ্য শিশু মাত্র। কিন্তু তাই বলে হাল ছাড়ল না সে।

আবার ছুটে গেল রানা ওর দিকে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল সে, লাফিয়ে স্টীল ফ্লোর ছেড়ে উঠে গেল ব্যারি। এবারেই মারবে সে তার শেষ লাথিটা- একটা অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাপ্তি ঘটবে।

বিশৃ^ল ভাবে আক্রমণ করে ব্যারিকে কাবু করা যাবে না ভেবে হঠাৎ থেমে পড়ল রানা। এদিকে শূন্যে উঠে পড়েছে ব্যারি। তার জয় নিশ্চিত- লাথিটা ভয়াবহ গতিতে লাগবে রানার হৃৎপিণ্ডের

ওপর- মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে ওর। প্রাণহীন দেহটা ডিগবাজি খেতে খেতে আছড়ে পড়বে টাওয়ারের তলায় কংক্রীটের ওপর।

তার লক্ষ্যে কোন ভুল ছিল না- যে শক্তিতে ছুঁড়েছে লাথিটা তা যে-কোন পালোয়ানকে প্রাণে মারার জন্যে যথেষ্ট। রানার তিন ইঞ্চি দূর দিয়ে গেল ওর পা। যে গতিতে এগোচ্ছিল রানা সেই গতিতে এগোলে ঠিক হৃৎপিণ্ডেই লাগত লাথিটা।

চিৎপাত হয়ে পড়ল ব্যারি লোহার ফ্লোরে। হাত দিয়ে ঠেকিয়ে পিঠটাকে কিছুটা বাঁচাল সে।

উড়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে পড়ল রানা বুকের ওপর। 'হুঁক' করে শব্দ হলো ওর মুখ থেকে। কলার ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দাঁড় করিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি মারল রানা ওর পেটে। দু'ভাঁজ হয়ে গেল ব্যারির শরীর- এবার রানার হাঁটু সজোরে গিয়ে লাগল ওর মুখে- টলতে টলতে পিছিয়ে গেল সে। লাথি খাওয়ার ঝালটা এতক্ষণে কিছুটা মিটিয়ে নিল রানা ওর পাঁজরে একটা লাথি মেরে। সাবধান হয়ে গেল ব্যারি।

কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না রানা। কাছেই ঘেঁষতে পারছে না সে ব্যারির। পায়ের রেঞ্জের মধ্যে গেলেই লাথি চালাচ্ছে ব্যারি। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জুডো হোল্ডে ব্যারির জামা ধরল রানা। হিপ থ্রো করে ওকে নিচে ফেলবে সে। কিন্তু তার আগেই ব্যারির লাথি খেয়ে আবার ছিটকে পড়ল রানা। মাটিতে আছড়ে পড়েই লাথির অপেক্ষা করছে রানা। মাংস পোড়া গন্ধ এল ওর নাকে। চোখ খুলে ব্যারিকে আশপাশে কোথাও দেখল না। হাতের মুঠো খুলে দেখল ব্যারির ট্যাগটা চলে এসেছে ছেঁড়া জামার সঙ্গে।

ল্যাপ লেজার তার নির্ধারিত কাজই করেছে। বাতাসে মাংস পোড়া গন্ধ ছাড়া ব্যারির আর কোন চিহ্নই রইল না।

রেস্তোরাঁয় কমপিউটর মনিটরের সামনে লেপঙের পাশে দাঁড়িয়ে কবির চৌধুরী। লেপং রিপোর্ট করল একটা ল্যাপ লেজার ফায়ার করেছে এইমাত্র। মনিটরের স্ক্রীনে লম্বা উজ্জ্বল রেখা দেখা যায় প্রত্যেক ফায়ারিঙের সাথে সাথে।

স্ক্রীনের দিকে মনোযোগ দিল কবির চৌধুরী- রাতের পাখি হতে পারে- তার শত্রুও হতে পারে। আবার একটা রেখা স্ক্রীনের এমাথা থেকে ছুটে চলে গেল ও মাথা পর্যন্ত- ব্যারির মৃত্যুটাই প্রত্যক্ষ করল সে স্ক্রীনে।

'আমাকে ফায়ারিঙের পজিশনটা দাও।' নির্দেশ দিল সে।

রবার্ট ঘরে ঢুকল একটু পরেই। অস্থির পায়চারি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী, 'ব্যারি কোথায়?'

'আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সাথেই আছে।'

'দেখতেই তো পাচ্ছ নেই,' খেঁকিয়ে উঠল কবির চৌধুরী, 'ডাকো ওকে ব্লীপারে।' রেডিও নিয়ে তাড়াতাড়ি সিগন্যাল পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রবার্ট। একটু অপেক্ষা করে আবার সিগন্যাল পাঠাল সে- এবারেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রবার্টকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে কবির চৌধুরী নিজেই বোতাম টিপে সিগন্যাল পাঠাল।

'জবাব দিচ্ছে না কেন?' বিরক্ত হয়ে বলল সে।

'হয়তো...'

'হয়তো কি?'

জবাব দিতে পারল না রবার্ট।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল কমিউনিকেশন ভ্যানের টেলিফোন। ফোন ধরে রিসিভার বাড়িয়ে দিল সোহানা রাহাত

খানের দিকে। 'প্রেসিডেন্ট জোন্স্,' বলল সে।

'রাহাত খান বলছি।'

'আমি জোন্স্, সিনেটের মীটিং শেষ হয়েছে- মুক্তিপণ দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা।'

'অত্যন্ত ভাল সিদ্ধান্ত। টাকাটা দিতে রাজি না হলে শুধু প্রেসিডেন্টকেই নয় গোটা যুক্তরাষ্ট্রকেই অপমান করা হত,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

'টাকাটা ক্যাশ দেয়া হচ্ছে। টাকা নিয়ে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার জন্যে এয়ারফোর্সের দুটো এফ ১১ তৈরি আছে- কিছুক্ষণের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে,' জানালেন প্রেসিডেন্ট জোনস।

'ঠিক আছে, ওদের নির্দেশ দিন সুইস ব্যাঙ্কে টাকা নিয়ে হাজির থাকতে- কিন্তু আমার টেলিফোন না পাওয়া পর্যন্ত যেন কবির চৌধুরীর অ্যাকাউন্টে জমা না দেয়। আরেকটা কথা- আপনি নিজে টেলিফোনে সুইস ব্যাঙ্কের হেড অফিসকে অনুরোধ জানান তারা যেন আজ রাত দশটা পর্যন্ত অফিস খোলা রাখে।' বক্তব্য শেষ করলেন রাহাত খান।

'তাহলে কি টাকাটা এখনই দেয়া হচ্ছে না?' মায়ের জন্যে একটু যেন উদ্বেগ প্রকাশ পেল তাঁর গলায়।

'আপনার মায়ের পূর্ণ নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রেখেই কাজ করব আমরা। আসলে শেষ সময় সীমা পর্যন্ত দেখতে চাই আমি। টাওয়ারে কবির চৌধুরীর লোকের সাথে আমারও দুজন এজেন্ট কাজ করছে। ভাল কর্মী ওরা। ওদের একজনকে ভাল করেই চেনেন আপনি...মাসুদ রানা।'

'তাই নাকি? মাসুদ রানা আছে ওখানে? অনেকটা ভরসা পাচ্ছি শুনে।'

‘ওর সাথে আরও একজন যোগ্য এজেন্ট রয়েছে আমাদের। আমি দেখতে চাই ওরা কতদূর কি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত টাকা দেয়ার সুযোগ তো থাকছেই।’

‘অগ্রগতির খবর...’

‘আমি আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব।’

‘ভেরি গুড। থ্যাঙ্কিউ।’ লাইন কেটে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

ভি আই পি রূম থেকেই রানা শুনতে পেল কবির চৌধুরীর গলা। পোর্টেব্‌ল্ লাউড স্পীকারে সবাইকে রেস্তোরাঁয় একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে।

সবাই জড়ো হয়েছে রেস্তোরাঁয়। রবার্টকে চেক করে দেখার নির্দেশ দিল কবির চৌধুরী।

‘ব্যারি হোমস, পিটার উডকক আর টিচ্‌ ছাড়া সবাই উপস্থিত, স্যার।’ রিপোর্ট করল সে।

‘গত পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমরা কেউ ব্যারিকে দেখেছ?’ সবার ফাঁকা চাহনি আর মাথা নাড়া ছাড়া কোন জবাব মিলল না।

‘কিংবা পিটার উডকককে?’ এবারেও একই উত্তর।

‘টিচ্‌কে দেখেছ কেউ?’

‘ভি আই পি রূমের সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি,’ জবাব দিল একজন কমান্ডো। ‘এই...দু’মিনিট আগেই।’

‘হুঁ,’ থমথমে গম্ভীর হয়ে গেছে কবির চৌধুরীর মুখ, ‘টাওয়ারে এমন জায়গা নেই যেখান থেকে আমার রেস্তোরাঁয় আসার নির্দেশ শোনা যাবে না। তোমরা সবাই পরিষ্কার শুনতে পেয়েছ। হয় তারা টাওয়ারে নেই- কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়- কিছু একটা ঘটেছে হয়তো। ওদের খুঁজে বের করতে হবে- এখনই।’

খোঁজার জায়গা ভাগ করে দিল কবির চৌধুরী তার লোকজনের মধ্যে। শেষ আদেশটা দিল ডেভিডকে- তারা একসাথে যাবে কবির চৌধুরীর সাথে ভি আই পি রূমে চেক করতে। ডেভিডের পিছন পিছন রবার্টও রওনা হলো। রূপাও। রূপার উপর ভার পড়েছে ভি আই পি রূম সহ পুরো ব্লকটার। অর্থাৎ প্রথম লেভেলের পুরোটা চক্কর দিতে হবে ওকে। ওখানে পৌঁছতেই দেখা গেল টিচ্ দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে।

'রেস্তোরাঁয় রিপোর্ট করোনি কেন?' ধমকে কৈফিয়ত চাইল কবির চৌধুরী।

'আপনিই তো হুকুম দিয়েছেন কোন অবস্থাতেই আমার পোস্ট ছাড়া চলবে না?'

'মাইকে দেয়া হুকুমটাও তো আমারই ছিল।'

কোন জবাব না দিয়ে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল টিচ্।

নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল কবির চৌধুরী। আসলেও টিচের পাহারায় থাকাটাই সঙ্গত কাজ হয়েছে।

'সব ঠিক তো?' জিজ্ঞেস করল কবির চৌধুরী।

'কেউ ধারে কাছেও ঘেঁষেনি। অন্তত আমি যতক্ষণ গার্ড আছি, কেউ আসেনি।'

নিজেই দরজা খুলল কবির চৌধুরী। ডেভিডকে দরজার কাছেই থাকতে বলে এগিয়ে গেল সে। চেয়ারটা ঠিক দরজার উল্টোদিকে ঘোরানো। ঘরে কেউ নেই। কাঁপা-কাঁপা হাতে জানালা খুলে বাইরে তাকাল কবির চৌধুরী, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পড়ল না তার চোখে।

ডেভিডের দিকে ফিরল সে। বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে

কপালে। তার চোখ একবার টিচ্ তারপর রবার্ট আর সবশেষে ডেভিডের ওপর ফিরে এল।

পরমুহূর্তে চিৎকার করে উঠল কবির চৌধুরী, 'তোমরা যে যেখানে আছ সবাই শুনে রাখো- এটা অসম্ভব!'

রবার্টকে বোকার মত তাকিয়ে থাকতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল তার। 'বোকার মত হাঁ করে দেখছ কি? খোঁজো! প্রত্যেকটা জায়গা, প্রত্যেকটা জিনিস তন্ন তন্ন করে খুঁজবে।'

এবার টিচ্‌কে নিয়ে পড়ল সে। শার্টের কলার ধরে ওকে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেউ ধারে কাছে আসেনি, না? বুড়িটা এখান থেকে বেরোল কি করে?'

টিচ্ হাতের ইশারায় জানালাটা দেখিয়ে দিল।

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? এই বয়সে? পাকা দড়াবাজ ছাড়া ওই পথে নামা অসম্ভব।'

'তা ঠিক, কিন্তু পিটার উডকক পারে,' বলল টিচ, 'আপনিও ট্রেনিঙের সময় দেখেছেন, তার পক্ষে যে কোন দুর্গম জায়গায় ওঠা বা নামা সম্ভব।'

'হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক। আমাদের এখন অঙ্ক কষে হিসেব করে কাজ চালাতে হবে। আমার স্থির বিশ্বাস ওরা এখনও টাওয়ারেই আছে। যাও, প্রত্যেকে খুঁজতে লেগে যাও।'

টিচ্ ভি আই পি রূমের তালা লাগাতেই কবির চৌধুরী ঘুরে দাঁড়াল, 'তালা দিয়েছ?' মাথা ঝাঁকাল সে। 'গুড।' তালা থেকে চাবিটা বার করে নিতে নিতে মন্তব্য করল কবির চৌধুরী।

লেপং এসে খবর দিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফোন করেছেন।

'নতুন কোন খবর আছে? নাকি সেই পুরানো গীতই গাইবে?' গত আলাপের পর থেকেই তার ওপর খেপে আছে কবির চৌধুরী।

'হ্যাঁ, অবশ্যই একটা খবর আছে আপনার জন্যে। সিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই প্রেসিডেন্টের মার এরকম অসহায় মৃত্যুর সম্ভাবনায় নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না। টাকা আমরা দেব- কিন্তু...'

'আবার কিন্তু কি?' কথার মাঝখানেই ধমকে উঠল কবির চৌধুরী।

'মানে খুবই তাড়াহুড়ো হয়ে যাচ্ছে আমাদের পক্ষে- সময়টা যদি একটু বাড়াতেন তবে খুব ভাল হত।'

'রাত দশটা- এটাই আমার শেষ কথা।' টেলিফোন ছেড়ে দিল কবির চৌধুরী।

সোফার আড়ালে মেঝেতে বসে আছে দু'জনেই। ভি আই পি রুম থেকে সবাই বেরিয়ে যেতে বদ্ধাকে নিয়ে রানা আবার ভি আই পি রুমেই ঢুকেছে। পুরো টাওয়ারে এটাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ভুলেও কেউ এখানে ওদের খোঁজ করতে আসবে না। এতক্ষণ অন্ধকারে একটা গার্ডারের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সে মিসেস জোনসকে নিয়ে। জানালা গলে ফিরে এসেছে আবার।

'এবার কি করবে কিছু ঠিক করেছ, মিস্টার উডকক?' মিসেস জোনস জানতে চান।

'রানা,' হাসল সে, 'এরা আমাকে পিটার উডকক বলে জানলেও আমার আসল নাম মাসুদ রানা। আপনি আমাকে রানা বলেই ডাকবেন।' বলতে বলতে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ওরা খুঁজে পাওয়ার আগেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের। প্রথম কাজ হচ্ছে ডাইভার্শন।'

একটা বাল্‌ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা। পট্টি লাগাল সে

বাল্বের চারপাশে- তারপর সুইচ অন করল। শুধু বাল্বের লাল আভাটুকু দেখা যাচ্ছে এখন। জানালার ধারে এসে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল রানা। সে জানে রাহাত খান অপেক্ষা করছেন তার সিগন্যালের জন্যে।

সোহানা কমিউনিকেশনস ভ্যানের ছাদে শুয়ে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে নজর রেখেছে টাওয়ারের ওপর। কনুইয়ে ভর দিয়ে অনেকক্ষণ থাকার পর এখন শুয়েছে চিৎ হয়ে। কিন্তু পাঁচ মিনিটও যায়নি টাওয়ারের একটা আলো জ্বলতে নিভতে দেখে হুড়মুড় করে সিধে হয়ে বসল সে।

গাড়ির ছাদে শব্দ শুনে কি হলো জানতে চাইলেন রাহাত খান।

'টাওয়ারে একটা আলো জ্বলছে আর নিভছে- কোন সিগন্যাল হতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক তাই- রানা যোগাযোগ করছে- ' প্রথম কয়টা কথা বুঝতে পেরে জানাল সোহানা।

মেজর জেনারেল আর মশিয়ে পম্পেদু দু'জনেই বেরিয়ে এলেন সোহানার কথায়।

'কি বলছে রানা?' অসহিষ্ণু ভাবে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'আমাদের পক্ষে আরও একজন কাজ করছে- নাম ডেভিড।' মেসেজ জোরে জোরে পড়ে যাচ্ছে সোহানা। 'আমি মিসেস জোনসকে নিয়ে পালাবার চেষ্টায় আছি- সবাই খোঁজাখুঁজি করছে আমাদের- ডাইভার্শন দরকার- সম্ভব হলে মুক্তিপণের টাকা এখনই পাঠান।' মেসেজ শেষ করল সোহানা।

'মশিয়ে পম্পেদু,' বললেন রাহাত খান, 'যে করেই হোক টাকার একটা ব্যবস্থা এখন করতে হবে।'

'আমি এখনই ফোন করছি ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে। আগেই বলা আছে। টাকা রেডি থাকারই কথা।'

ফোন তুলে নিলেন মশিয়ে পম্পেদু, 'কনফারেন্স রূম? পম্পেদু বলছি, ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে চাই। জলদি।'

রেস্তোরাঁয় পায়চারি করছে কবির চৌধুরী। বোঝা যায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। ডান হাতে ঘোড়া ছোটাবার ছড়ি। ছড়ি দিয়ে কখনও টেবিলের ওপর, কখনও বা সোফার পিছনে সপাং সপাং বাড়ি মারছে সে। ডেভিড টেলিফোনে রিপোর্ট নিচ্ছে- রূপা আর রবার্ট ওয়াকি টকির রিপোর্ট প্যাডে নোট করছে।

'কেউ কিছু রিপোর্ট করেছে?' ক্রমেই যেন আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কবির চৌধুরী।

মাথা নাড়ল ডেভিড, রূপা আর রবার্টও নতুন কোন তথ্য দিতে পারল না।

'কিন্তু উডকক কিভাবে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিল?' কপাল কুঁচকে গেছে কবির চৌধুরীর। 'এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে ও আসলেই উডকক কিনা।'

'কিন্তু ডাক্তারের রিপোর্টে তো জন্মদাগ পর্যন্ত মিলে গেছে?' কবির চৌধুরীর সন্দেহ ভঞ্জন করতে চাইল রবার্ট।

'ছদ্মবেশ সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা থাকত তোমার তাহলে বুঝতে।'

'আমি বাজি রেখে বলতে পারি- সব রেকর্ড আমি চেক করেছি- ও ঠিকই উডকক। সবই একদম ঠিক ঠিক মিলেছে।'

'দেখা যাবে- সেটা দেখা যাবে। আমার হয়ে যারা কাজ করে তারা কেবল একটাই ভুল করার সুযোগ পায়।' ক্রূর হাসি ফুটে উঠল কবির চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে। 'তুমিও তোমার শেষ ভুলটা করেছ কিনা কে জানে?'

রবার্টের মনে হলো যেন মুখ থেকে তার রক্ত সরে যাচ্ছে। সে-ই নতুন পাঁচজনকে পরীক্ষা করে, রেকর্ড চেক করে ও. কে. করেছিল।

হঠাৎ রূপার সামনে এসে থামল কবির চৌধুরী। 'তোমার সাথেই লক্ষ করেছি ওর খাতির ছিল সবচেয়ে বেশি।' ছড়ির মাথায় লাগানো চামড়া রূপার গালে ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে নিচে টেনে থুতনির তিলটার ওপর এনে স্থির করল কবির চৌধুরী।

বিরক্তিকর একটা পরিস্থিতি। এক পা পিছনে সরে গেল রূপা। 'অপমানিত হওয়ার জন্যে আপনার সাথে যোগ দিইনি আমি। কেউ বলতে পারবে না আমার কর্তব্যে আমি বিন্দুমাত্র অবহেলা করেছি।'

ছড়িটা সরিয়ে নিল কবির চৌধুরী।

'আমিও একই কথা ভেবেছিলাম,' বলে উঠল ডেভিড, 'আপনি যেদিন বলেছিলেন বেশি হৃদ্যতা ঠিক নয়, সেদিন থেকেই প্রায় ছায়ার মত ওদের পেছনে আমি লেগে ছিলাম- কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছুই পাইনি।'

'হতে পারে- হতে পারে।' বলতে বলতে আবার উত্তেজিত ভাবে পায়চারি শুরু করল কবির চৌধুরী। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েই ছড়িটা সশব্দে নামিয়ে আনল সে টেবিলের কাচটার ওপর। 'খুঁজে ওদের পেতেই হবে।' ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ল কবির চৌধুরীর কণ্ঠস্বর।

ফোন নামিয়ে রাখল মশিয়ে পম্পেদু। স্পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টাকা পৌঁছে দেয়া হবে টাওয়ারে। কবির চৌধুরীকে খবরটা এখনই জানানো হবে।'

রাহাত খান সোহানাকে বললেন খবরটা রানাকে জানিয়ে দিতে। টর্চ নিয়ে সিগন্যাল পাঠানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহানা। এমন একটা কোড ব্যবহার করছে যেটা বি.সি.আই এজেন্ট ছাড়া আর কারও পক্ষে ডিসাইফার করা সম্ভব নয়। টাওয়ার থেকে আর কেউ লক্ষ করলেও বুঝবে না কিছু।

গদিতে হেলান দিয়ে বসে মশিয়ে পম্পেদু তাঁর উৎকট গন্ধের টোব্যাকো পাইপটা ধরালেন। খোলা জায়গায় বলে আর আপত্তি করলেন না রাহাত খান। কনফারেন্স রুমে ওই পাইপ খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। 'ঘটনা পরিণতির দিকে যাচ্ছে, -অথচ আমরা এখনও জানি না কবির চৌধুরী টাওয়ার ছেড়ে কোন্ পথে পালাতে চায়,' মন্তব্য করলেন মশিয়ে পম্পেদু।

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল। প্যারিস সিটি ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সুপারিনটেন্ডেন্ট তখনও ব্যস্ত টাওয়ারের ম্যাপ নিয়ে। তার দিকে এগিয়ে গেলেন রাহাত খান, 'আপনি কি একেবারে নিশ্চিত যে কোন রকম কোন সুড়ঙ্গ পথ বা প্যাসেজই নেই টাওয়ারের তলায়?'

'বলেছি তো স্যার, তেমন কোন পথ অন্তত এই ম্যাপে দেখানো নেই। টাওয়ারের চারটি খুঁটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে, এখানে, এখানে আর এখানে।' ম্যাপের ওপর আঙুল ঠুকল সে। 'হ্যাঁ, একটা ইলেকট্রিকাল ইন্সপেকশন চেম্বার আছে। কবির চৌধুরীর লোকজনকে ওখানে ইলেকট্রিক তার নিয়ে যেতে দেখা গেছে। কোন রকম সুড়ঙ্গ পথ টাওয়ারের তলায় নেই। আছে পানির পাইপ, পাওয়ার লাইন, আর আছে নিউমাটিক্স্ আর হাইড্রলিক্স্- সবগুলোই রয়েছে চালু অবস্থায়।'

পম্পেদু বললেন, 'ওদের একটা হেলিকপ্টার আছে আমরা

জানি- কিন্তু ওটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়- এয়ারফোর্স ছাতু করে দেবে হেলিকপ্টার।'

'হেলিকপ্টার!' উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'অবশ্যই, ওরা যদি কোন স্টেজে ওটা ব্যবহার করার প্ল্যান করে থাকে- পাইলট জানবে কোথায় কখন কবির চৌধুরীকে তুলে নিতে হবে। আর্মি জেনারেলকে চাই আমি। স্যাতো দখল করে ওই পাইলটকে ধরে আনতে হবে।'

টেলিফোন ডিউটিতে রয়েছে লেপং। রিং হতেই রিসিভার তুলল, ও-প্রান্তের বক্তব্য শুনে বলল, 'এক মিনিট ধরুন, আমি স্যারকে ডেকে দিচ্ছি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে গ্যালারির দিকে ছুটল লেপং। একটা সার্চ পার্টি সহ খালি হাতেই ফিরছে কবির চৌধুরী। 'তিরিশ মিলিয়ন ডলার রেডি, স্যার- আপনি কখন ডেলিভারী চান জানতে চাইছে ওরা।'

'বেশ, বেশ, এই তো পথে আসছে। ডেভিড, একটা সার্চ লাইট দিয়ে সদর রাস্তার ওপর আলোর ব্যবস্থা করো। যে কেউ দাগের দিকে আসবে তার ওপরই স্থির ভাবে আলো ধরবে। কোন রকম চালাকির সুযোগ যেন না পায়। রবার্ট, দু'জন লোককে পাঠাবে টাকা নিয়ে আসার জন্যে।'

রিসিভার তুলে নিল কবির চৌধুরী। 'হ্যালো...হ্যাঁ, আমরা এখনই ডেলিভারী নিতে প্রস্তুত...পাঠিয়ে দিন।' অল্প কথায় কাজ সারল সে।

পন্ট দিয়েনা যেখানে কোয়েই ব্রানলিকে বিভক্ত করেছে- টাওয়ারের

নদীর ধারের সেই দিকটা থেকে একটা মিলিটারি আর্মার্ড ট্রাক দাগ আর ব্যারিকেডের মাঝামাঝি জায়গায় এসে থামল। ফরাসী সেনাবাহিনীর আটজন কমান্ডো নামল গাড়ি থেকে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসা অফিসারের দিকে গেল সবাই, পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।

চড়া গলায় কি একটা নির্দেশ দিল অফিসার। ফ্লোরেসেন্ট পেইন্ট দিয়ে একজন মাটিতে একটা দাগ কাটল। বাকি সবাই ট্রাকে ফিরে গিয়ে চারটে অ্যালুমিনিয়াম সুটকেস বের করে আনল। অফিসারের নির্দেশে কবির চৌধুরীর দেয়া দাগের তিন ফুট দূরে লাইন করে সাজিয়ে রাখল ওরা বাক্সগুলো।

টাওয়ার থেকে সার্চ লাইট জায়গাটাকে দিনের মত উজ্জ্বল করে ফেলেছে। মুখ ঢাকা দুটি মূর্তি দেখা গেল টাওয়ারের নিচে- টাকা নিয়ে যেতে আসছে ওরা।

আটজন কমান্ডো দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে- সবাই সশস্ত্র ও প্রস্তুত। বাছাই করা লোক এরা। পৃথিবীর সেরা ট্রেনিংপ্রাপ্ত এজেন্টদের সাথে মোকাবেলা করেও মাঝে মাঝে জিতেছে বলে রেকর্ড আছে ওদের।

টাওয়ারের লোক দু'জন দাগের একটু ভিতরেই থেমে দাঁড়াল। বুক পকেটের কাছে লাগানো ট্যাগ গাড়ির হেড লাইটের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। ওদের মধ্যে একজন ওয়াকি টকিতে যোগাযোগ করল রবার্টের সাথে। বিনকিউলার দিয়ে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে নিয়ে কি যেন নির্দেশ দিল ওয়াকি টকিতে।

একজন সঙ্গীকে ছেড়ে দাগের দুই ফুটের মধ্যে এগিয়ে এল। বাক্সগুলো দেখিয়ে সে বলল কবির চৌধুরী ওগুলো দাগের ওপর চায়।

'অর্ডার নেই। আমার আর একচুল সামনে এগোবার উপায় নেই।' জবাব দিল তরুণ অফিসার। 'তোমার নিতে হয় যেখানে আছে সেখান থেকে নিয়ে যাও।'

একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল যেন কবির চৌধুরীর কমান্ডো। মনে মনে হিসেব করল সে দাগ থেকে সুটকেসের দূরত্ব। দাগের বাইরে বের হলেই আট-আটজন সশস্ত্র সৈনিকের সম্মুখীন হতে হবে- অর্থাৎ নির্ঘাত মৃত্যু। ফিরে গেল সে সঙ্গীর কাছে- রবার্টের সাথে যোগাযোগ করল আবার।

নির্দেশ পেয়ে এবার দু'জনেই এগিয়ে এল একসঙ্গে। দাগের খুব কাছে। 'কবির চৌধুরীর নির্দেশ, ওগুলো দাগের সাথে ছুঁইয়ে রাখতে হবে। আর তা যদি না করা হয় তবে পরিণতির জন্যে কবির চৌধুরী দায়ী থাকবেন না।' চড়া গলায় বলল ওদের একজন।

'কবির চৌধুরী কে? তার নির্দেশ আমি মানতে যাব কেন?' বলল তরুণ অফিসার, 'আমি যার আদেশ মেনে চলি তিনি হচ্ছেন আমাদের চীফ জেনারেল ব্রুনো; কবির চৌধুরীর ইচ্ছায় এখানে কোন কাজ হবে না।'

'ভুল করছ, তোমাকে কবির চৌধুরীর ইচ্ছা মতই কাজ করতে হবে।' কথা বলে উঠলেন রাহাত খান পিছন থেকে। এগিয়ে এসে লেফটেনেন্টের সামনে দাঁড়ালেন তিনি। 'ওগুলো দাগের ওপর নিয়ে গিয়ে রাখো।'

'আপনাকে চিনতে পারলাম না, মশিয়ে,' বলে উঠল অফিসার।

'আমি একজন জেনারেল। তোমাদের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত অনুরোধে আমি রেড্ প্রায়োরিটি নিয়ে এই অপারেশনের প্রধান

হিসাবে কাজ করছি। জেনারেল ব্রুনোর সাথে একটু আলাপ করে নিলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তোমার।'

অস্বস্তির ভাব দেখা গেল অফিসারের মধ্যে। 'এক মিনিট, স্যার- আমি একটু আসছি।' ট্রাকের পিছন দিকে গিয়ে ওয়াকি টকিতে সে কি যেন কথাবার্তা বলল- দুই মিনিট পর ফিরে এসে বলল, 'আপনার কথা মতই কাজ হবে, মশিয়ে জেনারেল।' তারপর বাক্সগুলো দেখিয়ে নির্দেশ দিল সে। দু'জন কমান্ডো খুব সাবধানতার সঙ্গে বাক্স চারটে দাগ ছুঁইয়ে রেখে এল। কবির চৌধুরীর কমান্ডো দু'জন দু'হাতে দুটো বাক্স নিয়ে রওনা হলো টাওয়ারের দিকে।

টাকাগুলো গোণার জন্যে একটা দল আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, ওরা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কবির চৌধুরী তাদের কাজে লাগিয়ে দিল। কমান্ডো দু'জনের কাছে পুরো ঘটনা শুনল সে- চেহারার পু^ানুপু^ বিবরণ জানতে চাইল বাক্সগুলো দাগের ওপর রাখা হলো যার কথায় সেই বৃদ্ধের।

রাহাত খান! চমকে উঠল কবির চৌধুরী। এই লোক মেজর জেনারেল রাহাত খান না হয়েই যায় না! আর রাহাত খান মানেই রানা! দ্রুত চিন্তা চলেছে তার মাথায়। এখন বুঝতে পারছে সে পিটার উডককে কেন তার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।

জাপান থেকে তৈরি হয়ে আসা লেন্সগুলো আরও আগেই কেন ফিট করেনি- তাই ভেবে রাগ হলো নিজের ওপর। চশমা জোড়া রেডি করবার জরুরী তাগিদ অনুভব করল সে নিজের ভেতর। রানার বিরুদ্ধে জিততে হলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সব কটাই প্রয়োজন পড়বে। যন্ত্রটা ফিট করার কাজে লেগে গেল সে।

ভি আই পি রূমের জানালার ধারে বসে আছে রানা। অন্ধকার ঘর- সামান্য আলো আসছে ন্যাকড়া জড়ানো বালবটা থেকে। দড়িটা টেনে রূমের ভিতর তুলে আনল সে। তারপর সেটাকে নিজের শরীরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে ফেঁসে আছি এখানে- এবার বের হতে চাই।'

'ঠিক, আমিও মুক্তি চাই,' বললেন মিসেস জোনস ম্লান মুখে।

'ঠিক আছে, উঁচু জায়গায় চড়তে কি আপনি ভয় পান?' প্রশ্ন করল রানা।

'ভয়ে মরে যাওয়ার অবস্থা হয়,' জবাব দিলেন তিনি।

একটু গম্ভীর হলো রানা। 'তাহলে আপনাকে সারাক্ষণ চোখ বুজে থাকতে হবে। উপায় নেই।'

ওদিকে রেস্তোরাঁয় নোট গোণার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বিদ্যুৎ বেগে আঙুল চলছে দু'জন গণনাকারীর।

রূপা আর ডেভিড রেস্তোরাঁয় দাঁড়িয়ে টাকা গোণা দেখছে। এত টাকা! গোটা ব্যাপারটা কেমন যেন অবাস্তব ঠেকছে রূপার কাছে।

হঠাৎ জানালা দিয়ে অস্পষ্ট নড়াচড়া চোখে পড়ল রূপার। চোখের ইশারায় ডেভিডকে জানাল সে। দু'জনেই লক্ষ করল দড়ি বেয়ে নিচে নামছে রানা। তার পিঠে মিসেস লিনডা জোনস- দুহাতে রানার গলা জড়িয়ে ধরে আছেন। রূপা আর ডেভিডের নজরের বাইরে চলে গেল রানা।

দড়ি বেয়ে দ্রুত নিচে নামছে রানা। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে তার। মিসেস জোনসের লম্বা চুল বাতাসে উড়ে এসে ওর চোখে পড়ছে বারবার। একটা ক্রস স্ট্রাটের ওপর দাঁড়িয়ে পাশে দাঁড় করাল সে মিসেস জোনসকে। শক্ত করে তাঁকে ধরে রেখে

কপালের ঘাম মুছে নিল শার্টের হাতায়। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বদ্ধার। চোখ বন্ধ রেখেই কাঁপা গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কতদূর?' নিচের দিকে তাকাবার জন্যে মুখ নামাতেই রানা তাঁর চিবুক ধরে বাধা দিল।

'নিচের দিকে তাকাবার কথা চিন্তাও করবেন না। শুধু এটুকু মনে রাখবেন, আমার জীবন থাকতে আপনার কোন বিপদ হবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আস্থা প্রকাশ করলেন বদ্ধা।

ধীরে ধীরে নিচে নামা শুরু হলো আবার। মিসেস জোনস পিঠের সাথে সেঁটে রয়েছেন। ওপরে কিছু একটার অস্তিত্ব অনুভব করে তাকিয়ে দেখল রানা, ডেভিড আর রূপা রেলিঙের ধার থেকে তার নিচে নামা লক্ষ করছে।

হঠাৎ টাওয়ারের একটা রিভেটে রানার সাফারী জ্যাকেটের বোতাম ফেঁসে গেল। কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো- কয়েক ইঞ্চি নামতেই শব্দটা হলো আরও জোরে। কাপড়ে টান লাগছে রানার। দড়ি ধরে খানিক ওপরে উঠল রানা, কিন্তু খুলল না, জামাটা ভাল মতই ফেঁসেছে।

'শক্তভাবে ধরুন আমাকে- আমার জামাটা আটকে গেছে।' সাবধান করল রানা মিসেস জোনসকে। হ্যাঁচকা টান দিতেই আর একবার কাপড় ছেঁড়ার শব্দ হলো- সেই সঙ্গে রানার বুক পকেটের সাথে ঝোলানো ট্যাগটা টাওয়ারের লোহার কাঠামোতে বাড়ি খেতে খেতে চলে গেল নিচে।

কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তিতে পরিণত হলো রানা। নিজের অজান্তেই চোখের পলক পড়ল একবার। এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে...অপেক্ষা করল সে মৃত্যু রশ্মির। পেরিয়ে গেল আরও

কয়েকটা সেকেন্ড- না, কিছুই ঘটল না। বুঝতে পারল রানা, মিসেস জোনসের ট্যাগটা কাভার দিচ্ছে ওকে। যতক্ষণ মিসেস জোনস জড়িয়ে ধরে আছে, ততক্ষণ সে নিরাপদ।

এগারো

টেলিফোন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন মশিয়ে পম্পেদু।

'কি- নতুন কোন খবর আছে?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

'হ্যাঁ, একশো প্যারাট্রুপার নামানো হয়েছিল স্যাতোয়। জায়গাটা এখন আমাদের দখলে।' জবাব দিলেন পম্পেদু।

'আর পাইলট? হেলিকপ্টার পাইলটের কি খবর?'

'তাকেও পাওয়া গেছে। কবির চৌধুরীকে নাকি তার সীন নদীর একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তুলে নেয়ার কথা আছে।'

'সীন নদী থেকে?' একটু অবাক হলেন মেজর জেনারেল। 'ঠিক কোথায়?'

'এখান থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে- স্ট্যাচু অভ লিবার্টি আর নোতরদাম চার্চের মাঝামাঝি একটা জায়গা।'

কবির চৌধুরী ওখানে পৌঁছবে কিভাবে? কোন টানেল বা প্যাসেজ নেই ওই টাওয়ারের তলায়। লেজারগুলো যদি সক্রিয় থাকেও নদী পর্যন্ত কবির চৌধুরীকে কাভার দিতে পারবে না-

রেঞ্জের বাইরে বের হলেই গুলি খাবে সে- তাহলে? কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে রাহাত খানের। কিভাবে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে টাওয়ার ছেড়ে পালাবে কবির চৌধুরী? প্ল্যান নিশ্চয়ই একটা আছে তার। পালাবার পথ না দেখে এতবড় একটা কাজে হাত দেয়ার মত কাঁচা লোক সে নয়। কিন্তু কি সেই পথ?

মাটি থেকে চল্লিশ ফুটের মত ওপরে থাকতেই রশি ফুরিয়ে গেল। পিঠের বোঝাটা একটু নেড়ে চেড়ে ঠিক করে নিল রানা- মিসেস জোনস গলা জড়িয়ে ধরায় দম আটকে আসতে চাইছে তার। বলল, 'শক্ত করে ধরে থাকুন- পক্ষীরাজ কিন্তু উড়বে এখন।' মিসেস জোনসকে রসিকতার সুরেই সাবধান করল রানা। 'দড়ি শেষ, লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে হবে এখন থেকে।'

উপর থেকে ট্রেস করে চলেছে ওদের ল্যাপ লেজার। ইঁদুরের কানের মত জিনিস দুটো একটু একটু নড়ছে। ল্যাপ লেজার কমপিউটর খুব সতর্কতার সাথে নজরে রাখছে ধীরে নিচে নেমে যাওয়া অদ্ভুত আকৃতির বস্তুটাকে।

চোখ জ্বালা করছে রানার...এক ফোঁটা ঘাম গেছে চোখে। কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে জ্বালাটা কমিয়ে নিল সে। এবার সাবধানে কোণাকুণি নেমে যাওয়া লোহার পাতটা বেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে আর এক ধাপ নিচে নামল। আবারও একই ভাবে নামল আরও এক ধাপ।

এখন দুটো ল্যাপ লেজার ওদের ট্রেস করছে। রানার সাথে সাথে নড়ছে লেজার গান দুটো- সব সময়েই পাল্লার মধ্যে রেখেছে তাকে।

ক্লান্ত হয়ে আসছে রানার হাত পা- কিন্তু থামার উপায় নেই।

রীতিমত টনটন করছে সবকটা পেশী। মিসেস জোনসকে পিঠ থেকে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নেবে, সে পথও খোলা নেই- মিসেস জোনসের সাথে ছাড়াছাড়ি হলেই ল্যাপ লেজারের আক্রমণ হবে ট্যাগবিহীন রানার ওপর। তাহলে দু'জনেই মরবে ওরা- বদ্ধার পক্ষে নিজের চেষ্টায় নিচে নামা একেবারেই অসম্ভব। হয়তো কিছুক্ষণ টিকতে পারবেন গার্ডার ধরে- কিন্তু তাঁর পক্ষে কতক্ষণ আর শূন্যে ঝোলা সম্ভব?

চিৎকার করে মিসেস জোনসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বলেই ধনুকের মত বাঁকা হয়ে লাফ দিল রানা। প্রায় আট ফুট দূরের একটা বীম চেপে ধরল সে- হাতের পেশী আর কাঁধের মাসলে প্রচণ্ড চাপ পড়ল দু'জনের ভার সামলাতে। লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামছে এবার রানা- আর দুটো বাকি। আবার একটা লাফ। এর পরেই পিচের রাস্তার ওপর পড়ল ওরা।

'আমরা সত্যিই নিচে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি?' অবাক বিস্ময়ে বললেন মিসেস জোনস। 'তোমার পিঠে চড়ে এতটা পথ নেমেছি আমি!'

'সত্যিই তাই- তবে বললে কেউই বিশ্বাস করবে না আমাদের কথা।' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'এখন আর একটা বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।' নিজের ট্যাগটা হারানোর কথা খুলে বলল সে। 'আমাদের দু'জনের কাছে এখন রয়েছে শুধু একটা ট্যাগ। নিচে নামার সময় একটা ট্যাগেই কাজ চলেছে বটে- কিন্তু এখন সমান জমির ওপর দিয়ে হাঁটার সময় ল্যাপ লেজার কেমন ব্যবহার করবে তা একেবারেই অনিশ্চিত। ঝুঁকি নিতে হবে- এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কবির চৌধুরীর লোকের হাতে ধরা পড়ার কোন মানেই হয় না। আপনি কি বলেন?'

'টেলিভিশনে তখন আমি যা বলেছি সে-কথাগুলোই আবার বলব- অনেক বয়স হয়েছে আমার, মৃত্যু-ভয় আমাকে আর সাজে না। ওই যন্ত্রগুলো যদি আমাদের জীবন নাশ করে, এটুকু সান্ত্বনা আমাদের থাকবে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে, একজন সাহসী ব্যক্তির সাথে মরার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।'

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে রওনা হলো আবার। সেফটি ট্যাগটা দু'জনেই ধরেছে মাথার ওপর।

টাওয়ার থেকে দূরে সরে যেতে যেতে ওপরের দিকে চাইল রানা। দেখল তাদের সাথে সাথে ল্যাপ লেজারের নলটাও ঘুরছে।

কমপিউটরের কন্ট্রোল বোর্ড থেকে লেপং উত্তেজিত ভাবে কবির চৌধুরীকে রিপোর্ট করল, 'ল্যাপ লেজার কাকে যেন ট্রেস করছে- নিচে মাটিতে। টাওয়ার ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে বড়সড় কিছু একটা।'

'সার্চলাইট, ডেভিড!' হুঙ্কার ছাড়ল কবির চৌধুরী। গ্যালারিতে এসে দাঁড়িয়েছে সে। হঠাৎ আলোয় ভেসে গেল জায়গাটা। রবার্টের চিৎকার শুনতে পেল রানা। চিৎকার করে কবির চৌধুরীকে জানাচ্ছে তাদের পলায়ন প্রচেষ্টার কথা।

দাগের ওপাশ থেকেও আলো এসে পড়েছে রানাদের ওপর। খুশিতে চকচক করছে মেজর জেনারেলের চোখ। আর কয়েক পা এগোতে পারলেই দাগ পেরিয়ে যাবে ওরা।

'লেজার গান ফায়ার করছে না কেন?' দাবড়ানি দিল কবির চৌধুরী লেপংকে।

'ওদের কাছে সেফটি ট্যাগ আছে, স্যার,' জবাব দিল লেপং।

ওরা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কালাস্নিকভটা তুলে নিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল রবার্ট ওদের লক্ষ্য করে। সেফটি

ট্যাগবিহীন চলন্ত টারগেট চিনে তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো লেজার ব্যারেল। ঘন কালো লেজার বীম এক এক করে সব কটা বুলেট ধ্বংস করল নিপুণ ভাবে।

'থামো!' ধমক দিল কবির চৌধুরী। কিংকর্তব্য ভেবে নিয়েছে সে ইতোমধ্যেই। 'ওরা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। গুলি করে নিজের বোকামি প্রকাশ কোরো না। সার্চলাইট নিভিয়ে সবাই ভেতরে চলো- অনেক কাজ এখনও বাকি।'

দাগ পেরিয়েও মিসেস জোনস রানাকে জড়িয়ে ধরে থাকলেন। আবেগে ফোঁপাতে ফোঁপাতে রানার গালে কপালে চিবুকে আদর করে চুমো খেলেন তিনি।

মেজর জেনারেলের সঙ্গে পরিচয়-পর্ব শেষ হলে মিসেস জোনস বললেন, 'আমাকে নিরাপদে উদ্ধারের ব্যবস্থা করায় আমি কৃতজ্ঞ। টাওয়ার থেকে আমাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত পিঠে করে নামিয়ে আনার জন্যে এই দুঃসাহসী ছেলেটার কাছে আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ।'

'আপনি নিরাপদ আছেন, সেটাই বড় কথা,' বললেন রাহাত খান।

মিসেস জোনস একটু হাসলেন। বললেন, 'আমার বয়স হয়েছে, একদিন মরতে হবে, সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়; আসল কথা হচ্ছে ওই বর্বর নিষ্ঠুর লোকটার শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।' বলতে বলতে দৃঢ় হয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

'হবে, শাস্তি ওকে অবশ্যই পেতে হবে।' আশ্বাস দিলেন রাহাত খান। 'এখন আপনার জন্য...'

'হ্যাঁ, আমার জন্যে এখন চাই স্নানের ব্যবস্থা, কিছু খাবার, আর একটা কড়া ড্রিঙ্ক। কিন্তু তার আগে আমি আমার ছেলের

সাথে কথা বলতে চাই।’

‘লাইন ধরে আছেন তিনি।’

কমিউনিকেশন ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হলো মিসেস জোনসকে।

ভ্যানের এক কোণে একটা রঙিন টেলিভিশন সেট বসানো হয়েছে। মিসেস জোনসকে হারিয়ে এখন টাকা আদায়ের নতুন কোন পন্থা ঘোষণা করতে পারে কবির চৌধুরী। তাই শব্দ কমিয়ে অন্ রাখা হয়েছে টেলিভিশন।

ভ্যানের গায়ে টোকা পড়ল- আমন্ত্রণ জানানোর আগেই ভিতরে ঢুকলেন জেনারেল ব্রুনো। কাঁধ উঁচিয়ে হাত উল্টে তাঁর নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে বললেন, ‘মশিয়ে, এইবার কি আমি টাওয়ার আক্রমণ করতে পারি?’

‘জেনারেল ব্রুনো! খুব ঝট্‌পট্ কাজ দেখিয়েছে আপনার লোকজন স্যাতোয়। তবে আপনার প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, না। কোনমতেই টাওয়ার আক্রমণ করা চলবে না। আমাদের আরও দু’জন লোক কাজ করছে ওখানে- আমার বিশ্বাস ওরাই ব্যাপারটার একটা শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করতে পারবে।’

আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন মেজর জেনারেল- কিন্তু তার আগেই মশিয়ে পম্পেদু হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে টেলিভিশনের আওয়াজ বাড়িয়ে দিলেন। কবির চৌধুরীর মুখ দেখা গেল পর্দায়।

‘ফ্রান্সের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি।’ বলতে শুরু করল কবির চৌধুরী। চোখে তার অদ্ভুত ধরনের একটা চশমা। ‘দুঃখিত আমি, আমাকে আবার আপনাদের সান্ধ্য আনন্দে বাদ সাধতে হচ্ছে। ইন্টিরিয়র মিনিস্টার মশিয়ে পম্পেদু আর মেজর জেনারেল রাহাত খানের জন্যে কিছু খবর আছে বলেই বিরক্ত করতে হচ্ছে

আপনাদের।'

কথাগুলোতে বোমার মতই কাজ হবে, জানে কবির চৌধুরী। ভ্যানের ভিতর পরিস্থিতি এখন তড়িৎস্পৃষ্ট।

'মশিয়ে পম্পেদু এবং ফ্রান্সের সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্ত রিক ধন্যবাদ। তাঁদের দেয়া এই তিরিশ মিলিয়ন ডলার চাঁদা আমার বিশেষ কাজে আসবে। যাঁরা টেলিভিশন দেখছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মা মিসেস লিন্ডা জোনস টাওয়ার ছেড়ে চলে গেছেন।

'অবশ্য সব সময়েই আমি মিসেস জোনসের নিরাপদ বিদায়ের পক্ষপাতী ছিলাম। আমার কথামত চললে আমার কাছ থেকে তাঁর বিদায় এতটা বিপদ সঙ্কুল হত না।

'আমি খুশি হয়েছি যে মেজর জেনারেল রাহাত খানের লোক পিটার উডকক ওরফে মাসুদ রানা, ফিরতে সক্ষম হয়েছে- কিন্তু তাঁর অন্যান্য লোকের হয়তো সে সৌভাগ্য না-ও হতে পারে।'

একটু কুঁচকাল মেজর জেনারেলের ভুরু। তবে কি রূপা আর ডেভিড ধরা পড়ে গেছে? মেরে ফেলেছে কবির চৌধুরী ওদের?

'নির্ঘাত ব্লাফ দিচ্ছে ও!' রাহাত খানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মন্তব্য করলেন পম্পেদু।

'আপনারা অনেকেই ভাবছেন আমার চোখে লাগানো- কিছুটা চশমার মত দেখতে- জিনিসটা কি? আপনাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি এটা আমারই আবিষ্কার। একটা বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আমার চোখের ক্ষতি হয়- কিন্তু আমার এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন মানুষের চেয়ে দশগুণ বেশি দেখতে সক্ষম আমি এখন। দুঃখের বিষয় লেনস্‌টা ফিট করতে একটা দিন দেরি হয়ে গেছে আমার- সেই সুযোগে পালিয়েছে মাসুদ রানা। কিন্তু আমার

প্রশ্ন, কতদিনের জন্যে?

‘অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে আমার প্ল্যান কিছুটা পাল্টাতে হচ্ছে। আগের কয়েকবারের মত এবারও রানা বাদ সেধেছে আমার কাজে- ফলে বিশ বিলিয়ন ডলার আমি আপাতত পাচ্ছি না বটে, তবে ওটা আমি ভবিষ্যতে আদায় করবই।’

ঘড়ি দেখল কবির চৌধুরী। স্পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি আর আমার সঙ্গীরা আইফেল টাওয়ার ছেড়ে যাচ্ছি। আমার শখের স্যাতো আমি ফরাসী সরকারকে দান করে দিয়ে যাচ্ছি- তবে আমার প্ল্যানে বাধা সৃষ্টি করার শাস্তি স্বরূপ আইফেল টাওয়ারটা আমার চলে যাওয়ার ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই ধ্বংস হবে। আপনাদের সবাইকে শুভ রাত্রি জানিয়ে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।’ নাটকীয় ভাবে শেষ করল কবির চৌধুরী তার বক্তব্য।

বারো

কনুই মেরে ভিড় ঠেলে বহু কষ্টে পৌঁছাল রানা কমিউনিকেশন ভ্যানের কাছে।

‘পনেরো মিনিটের মধ্যেই কবির চৌধুরী টাওয়ার ছেড়ে চলে যাবে বলেছে- কিন্তু কিভাবে পালাবে ও, কোন ধারণা আছে তোমার?’ সরাসরি রানাকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। ‘আমরা

জানি হেলিকপ্টারে তাকে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করেছে সে সীন নদীর একটা জায়গা থেকে- কিন্তু ওখানে আমাদের সিকিউরিটি এড়িয়ে সে পৌঁছবে কিভাবে?'

'সম্ভবত পানি পথে। বেসমেন্ট ইন্সপেকশন চেম্বারে আমি অক্সিজেন ব্যারেল দেখেছি।' জবাব দিল রানা।

'অক্সিজেন সিলিন্ডার!' দ্রুত টেবিলে ছড়ানো ম্যাপগুলো ঘেঁটে টাওয়ার বেসের নক্সাটা বার করলেন রাহাত খান।

'ঠিক। চার ফুট ব্যাসের সুয়েরেজ পাইপ গেছে টাওয়ারের তলা দিয়ে।' নক্সার নানান দাগের মধ্যে এক জায়গায় আঙুল রাখলেন মেজর জেনারেল।

'টাওয়ার বেসে ইন্সপেকশনের জন্যে কোন ঢাকনা বা হ্যাচ আছে?'

'সে তো আধমাইল পর পরই আছে- ঠিক টাওয়ার বেসের নিচেই আছে একটা।' অপরাধীর মত জবাব দিল সুপারিনটেন্ডেন্ট। একটা পেনসিল দিয়ে বুটি বুটি দাগ কেটে এঁকে দেখাল টাওয়ারের নিচে ঠিক কোথা দিয়ে গেছে ওটা- আর হ্যাচটা কোথায়।

'কোথায় কোথায় যাওয়া সম্ভব ওই পাইপ দিয়ে?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'শহরের যে কোন জায়গাতেই যাওয়া সম্ভব, যদি অক্সিজেন থাকে।'

'সীন নদীতেও যাওয়া যাবে?' প্রশ্ন এল মশিয়ে পম্পেদুর কাছ থেকে।

'অবশ্যই। পাইপের পানি সরাসরি নদীতে গিয়ে পড়ছে।'

'আচ্ছা বিউ মুচের কাছে কোন্ জায়গায় নদীতে মিশেছে পাইপ?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

ম্যাপ দেখল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ‘হ্যাঁ ওখানেও একটা জায়গায় পাইপ নদীতে গিয়ে মিশেছে।’

প্রথম ল্যান্ডিঙে কবির চৌধুরী সবাইকে লিফটে ওঠার আদেশ দিল। জিম্মি আর কমান্ডোরা গাদাগাদি করে উঠল এলিভেটরে। পকেট থেকে একটা চাবি বার করে কবির চৌধুরী দিল লেপঙের হাতে।

একটা লাল বিপদ সঙ্কেত মার্কা বাক্সের গর্তে ঢুকিয়ে চাবি ঘোরাল সে। চাবির পাশেই ছোট্ট একটা কালো বোতাম। কবির চৌধুরী নির্দেশ দিল ওটা টিপে দেয়ার জন্যে। আদেশ অনুযায়ী কাজ করল লেপং। ‘ডে-ডেটোনেটর সক্রিয় এখন- ইচ্ছা ক-করলেও আর ফি-ফিরানো যাবে না। দ-দশ মিনিট সময় আছে আমাদের।’ একটু তোতলাল লেপং কথাগুলো বলার সময়।

‘ওগুলো কি লিফটে তুলে দেব?’ রেলিং-এ হেলান দিয়ে রাখা ক্যানভাস ব্যাগ কয়টা দেখিয়ে লেপং জানতে চাইল।

ক্রূর একটা সবজান্তা হাসির আভাস ফুটে উঠল কবির চৌধুরীর ঠোঁটে। ‘না, টাকার দেখাশোনা আমি নিজেই করব- তুমি আর সবার সাথে লিফটে ওঠো।’

লিফটের লোকজনের মধ্যে একটা অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। রেলিঙে হেলান দিয়ে হাতের মেশিন পিস্তল নেড়ে লেপংকে ধমক লাগাল কবির চৌধুরী, ‘যা বলছি করো।’

ঘেঁষাঘেঁষি করে কোনরকমে জায়গা করে নিল সে রূপা আর ডেভিডের পাশে।

‘গেট বন্ধ করো।’ সদ্য মুক্তি পাওয়া লিফটম্যানকে তাড়া দিল কবির চৌধুরী।

বন্ধ হয়ে গেল ভারী লোহার গেট।

অবজ্ঞার সাথে একটু হেসে কবির চৌধুরী বলল, 'তোমরা সবাই চমৎকার ভাবে সাহায্য করেছ আমার কাজে- সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। অ রিভ্যু।'

নিচে নামার বোতাম টিপে দিল চৌধুরী। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চোখের আড়ালে চলে গেল লিফট। ওয়াকিটকিতে রবার্টের সাথে যোগাযোগ করল কবির চৌধুরী, 'প্রথম ল্যান্ডিঙে আমার কাছে রিপোর্ট করো, এক্ষুণি।' কথাটা বলেই দেয়ালের গায়ে বসানো একটা লিভার টেনে দিল সে। টাওয়ারের ইলেকট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই-এর মেইন সুইচ এটা- কারেন্ট অফ হয়ে গেল। খুব প্রশান্তির সাথে সে লক্ষ করল ঝাঁকুনি খেয়ে মাঝ পথে থেমে গেছে লিফট।

ক্যানভাসের ব্যাগগুলোর মাথা পাতলা চামড়ার ফালি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। পকেট থেকে নিকেলের ক্লিপ বার করে প্রত্যেকটা ব্যাগের মাথায় তা এঁটে দিয়ে সবগুলোকে ওয়াটার প্রুফ করে নিল কবির চৌধুরী।

রবার্ট এসে পৌঁছতেই ব্যাগগুলো নিয়ে নিচে নামার নির্দেশ পেল। চোখে লাগানো অদ্ভুত যন্ত্রটার একটা নব ঘুরিয়ে দুদিকে উঁচিয়ে থাকা এন্টেনা দুটোর কোণ ঠিক করে নিল কবির চৌধুরী। রেলিঙ ধরে একটু এগিয়ে ঝোলানো দড়িটার কাছে এল সে। প্রায় অর্ধেক পথ তখন নেমে গেছে রবার্ট। সড়সড় করে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল কবির চৌধুরী। রানার নামাটা নিশ্চয়ই এত সহজ হয়নি, নিজের মনেই হাসল একটু।

জেনারেটর ট্রাকগুলোর ভীষণ গর্জনের মাঝখান দিয়ে

ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেকশন চেম্বারের দিকে এগোল সে।

লিফটের ভিতরে দুঃসহ এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। দু'হাতে খামচে ধরল ডেভিড লেপং-এর কাঁধ, স্প্লাস্টিক চার্জ- ওগুলো কি সক্রিয় করা হয়েছে?'

কোন জবাব না দিয়ে বোকার মত মাথা ঝাঁকাল লেপং। রাগে অন্ধ হয়ে লিফটের কাঁচের ওপর ঘুসি মারল ডেভিড। 'হারামজাদা আমাদের সবাইকে মারতে চায়!' চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু বুদ্ধি হারালে চলবে না। লিফটে বসার জন্যে রাখা লোহার বেঞ্চটার ওপর চোখ পড়ল ডেভিডের।

'টিচ্, হাত লাগাও।' এক লাফে টিচ্ বেঞ্চটার অন্য প্রান্তে চলে গেল। দু'জনে মিলে বেঞ্চটা তুলে নিয়ে সজোরে আঘাত করে ভেঙে ফেলল একটা জানালা। সবাই তখন হুড়োহুড়ি করছে জানালার কাছে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু ফাঁকটা খুব ছোট। 'আবার মারো।' কয়েক পা পিছিয়ে এসে ছুটে গিয়ে আবার আঘাত করল তারা। একটা মানুষ গলে বের হওয়ার মত ফোকর সৃষ্টি হয়েছে এখন জানালার গায়ে।

'কি করতে হবে জানা আছে?' রূপাকে জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

'জানি- কিন্তু সময়ে কুলাবে তো?'

'যে-ভাবেই হোক নিষ্ক্রিয় করতে হবে ওগুলো। শেষ চেষ্টা তোমার করতেই হবে। আমি যাচ্ছি কবির চৌধুরীর খোঁজে।'

লিফট থেকে বেরিয়ে রূপা গেল উপর দিকে আর ডেভিড নিচের দিকে।

রূপা অনুমান করল, হাতে সময় আছে মিনিট ছয়েকের মত,

এই সময়টুকুর মধ্যেই চার চারটে চার্জ নিষ্ক্রিয় করতে হবে তাকে।

দড়িটা তখনও বাতাসে দুলছে। ওটা বেয়েই নেমে গেছে কবির চৌধুরী। অন্তত দুটো প্লাস্টিক বোমার কাছে পৌঁছার ব্যাপারে সাহায্য করবে দড়িটা, কিছু মূল্যবান সময়ও বাঁচবে। হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরে ফেলল রূপা। তরতর করে বেয়ে উঠে গেল সে পশ্চিম দিকের বোমাটার কাছে।

একটা ক্রস স্ট্রাটের ওপর দাঁড়াল রূপা- দড়িটা দু'পায়ের ফাঁকে আটকানো। পুটির মত প্লাস্টিকের গভীরে সক্রিয় ডেটোনেটরটা রয়েছে। সাবধানে হাত বাড়াল সে- মৃদু মৃদু কাঁপছে আঙুলগুলো, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ও।

বাতাসের প্রবল এক ঝাপটা রূপাকে প্রায় গার্ডারের ওপর নিয়ে ফেলল। বোমাটা থেকে ওর মাথা এখন মাত্র ছয় ইঞ্চি দূরে। আঙুলটা অবশ্য অনেক দূর ভিতরে ঢুকিয়েছে সে- কিন্তু ডেটোনেটরটা এখনও ছুঁতে পারেনি। লটকে রয়েছে সে শূন্যে, উৎকণ্ঠায় বড়-বড় হয়ে উঠেছে চোখ দুটো।

ছোট লাল বাক্সটার ঘড়ি টিক টিক করে সময় গুনে চলেছে, ৫.১৫...৫.১৪...৫.১৩...

নিচে নেমে কোন জায়গা খুঁজতে বাদ রাখেনি ডেভিড, কিন্তু কবির চৌধুরীর টিকিটিরও কোন চিহ্ন নেই। একেবারে হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেছে সে। ইলেকট্রিক্যাল ইন্সপেকশন চেম্বারে শুধু পড়ে আছে রবার্টের রক্তাক্ত দেহ।

ডেভিডের পৌঁছার কিছুক্ষণ আগেই ওই চেম্বারে ঢুকে বিয়ার ব্যারেল পরীক্ষা করে দেখেছে কবির চৌধুরী। হ্যাঁ, প্রেশার ঠিক আছে। তার সামনেই রয়েছে তিনটে ক্যানভাস ব্যাগ, তাতে

তিরিশ মিলিয়ন ডলার।

কোন্ পথে কিভাবে পালাবার পরিকল্পনা নিয়েছে কবির চৌধুরী তা এখন জলের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রবার্টের কাছে। বদমেজাজী লোকটার সাথে দুটি বছর কাটিয়েছে সে। এতদিনে তার ভাগ্য খুলেছে- পিছন থেকে একটা গুলি বিঁধিয়ে দিলেই তিরিশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারে সে একা! হোলস্টার থেকে পিস্তল বার করার জন্যে ধীরে ধীরে হাত বাড়াল সে।

ঝট করেই ঘুরল কবির চৌধুরী। হাতের মাউজার মেশিন পিস্তল রবার্টের বুক বরাবর তাক করা। 'কোন চালাকি চলবে না।' ধমকে উঠল সে।

একেবারে জমে গেছে রবার্ট। ওর কি পিছন দিকেও চোখ আছে? অবাক বিস্ময়ে ভাবছে সে। টের পেল কি করে যে খুন হতে যাচ্ছিল সে?

রবার্টের চোখে অবিশ্বাস দেখেই হয়তো কবির চৌধুরীর ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির একটা হাসি ফুটল। 'আমার নিজের আবিষ্কার এটা।' নিজের চোখে লাগানো অদ্ভুত চশমাটা দেখিয়ে বলল সে। 'শুধু সামনে কি ঘটছে তা-ই নয়- পিছনে কি ঘটছে সেটাও আমি টের পেয়ে যাই এটার সাহায্যে।'

'আ…আমি…'

'চুপ! আমার জন্যে যারা কাজ করে তারা মাত্র একবারই ভুল করার সুযোগ পায়। তোমার প্রথম ভুলটা তুমি এইমাত্র করেছ।' ধীরে মেশিন পিস্তলটা ওঠাল কবির চৌধুরী রবার্টের কপাল বরাবর। পরপর তিনটা গুলি করল সে। রবার্টের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের কাছেই।

অক্সিজেন ব্যারেলটা চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে পিঠে বেঁধে নিল

কবির চৌধুরী। ব্যারেলের নলের সঙ্গে রবারের টিউব লাগিয়ে মাস্কটা পরে নিল সে। ক্যানভাস ব্যাগ তিনটে রবারের তিনটে ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগ তিনটে একত্রে বেঁধে নিয়ে পাইপের ইন্সপেকশন হ্যাচ খুলে নেমে পড়ল ভেতরে। চার ফুট ব্যাসের পাইপ। ভেসে চলল কবির চৌধুরী সীন নদীর উদ্দেশে।

ইন্সপেকশন চেম্বারে রবার্টের মৃতদেহটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। পিছনে মৃদু একটা শব্দ হতেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। দাঁড়িয়ে আছে রানা।

কি বলতে যাচ্ছিল ডেভিড, কিন্তু তার সুযোগ দিল না রানা। 'রূপা কই?' জিজ্ঞেস করল সে।

টাওয়ারের ওপরের দিকটা নির্দেশ করল ডেভিড। 'ওদিকে রূপা এখন পাঁচ মিনিটের মধ্যে চারটে বোমা নিষ্ক্রিয় করার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কবির চৌধুরী গেল কোন্ পথে? ওকে আমার চাই।'

'আন্ডার গ্রাউন্ড পাইপের ভেতর দিয়ে গিয়ে সীন নদীতে আধমাইল দূরে ভেসে উঠবে সে। ভেবো না, ধরা পড়বে ও। রূপার সাহায্য দরকার, আমি যাই।' ছুটল রানা। যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছতে হবে ওকে।

ডেভিডের নামতে যত সময় লেগেছিল প্রায় একই সময় নিল রানা দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে।

কয়েকশো ফুট ওপরে রূপা তখন হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজছে ডেটোনেটরটা। মাত্র এক সেন্টিমিটার দূরেই রয়েছে সেটা।

ওদিকে অবিরাম সময় গুনে চলেছে ঘড়ি ৪.২২...৪.২১...৪.২০...

তেরো

খুঁজে পেয়েছে রূপা। দুই আঙুলের নখে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে এক এক মিলিমিটার করে ডেটোনেটরটা বার করে আনল সে। বিচ্ছিরি একটা শব্দ তুলে ওটা বিচ্ছিন্ন হলো আঠাল প্লাস্টিক চার্জ থেকে। হাত থেকে ছেড়ে দিতেই নিচের দিকে রওনা হলো ওটা। সশব্দে শ্বাস ছাড়ল রূপা। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'একটা গেল, আরও বাকি তিনটা!'

লাল বাক্সের ঘড়ি এগিয়ে চলেছে ৩.৫২...৩.৫১...৩.৫০...৩.৪৯...

দড়ি বেয়ে নেমে এল রূপা। দ্বিতীয় চার্জটার সামনে স্ট্রাটের ওপর দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তার ঠিক মুখের সামনেই রয়েছে ওটা। ভেতর থেকে কে যেন বার বার বলছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারো! এখনও কয়েকটা বাকি!

কিন্তু ও ভাবছে, আর সময় নেই। বিরাট টাওয়ারটা যখন ভেঙে দুমড়ে টুকরো টুকরো হয়ে নিচে পড়বে- তখনও টাওয়ারেই থাকবে রূপা।

টাওয়ারের কাঠামো বেয়ে উঠছে রানা। একবার টর্চ জ্বালল

রূপাকে খুঁজে বার করার জন্যে- দেখল রূপা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে একটা বোমার মধ্যে। কোন শব্দ করল না রানা। তাতে চমকে যেতে পারে রূপা, হারাতে পারে দেহের ভারসাম্য!

ততক্ষণে ডেটোনেটরটা বের করে এনেছে রূপা। দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে কপালের ঘাম মুছে নিল সে কমব্যাট জ্যাকেটের হাতায়।

'রূপা, আর ক'টা বাকি?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল রূপা, 'আরও দুটো।'

অর্থাৎ টাওয়ারটাকে বাঁচাবার জন্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালাবে সে! অধীর হয়ে উঠেছে রানা, ওপরে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রূপারও জীবন-মরণ নির্ভর করছে এর ওপর।

ঘড়ি টিক টিক করে চলেছে ২.৪৮...২.৪৭...২.৪৬...

নিচে চারদিক থেকে আর্ক ল্যাম্পের আলো ফেলা হয়েছে টাওয়ারটার ওপর।

'আর কতক্ষণ সময় আছে?' জেনারেল ব্রুনো জিজ্ঞেস করল মশিয়ে পম্পেদুকে। দুজনেরই চোখে বিনকিউলার, টাওয়ারের দিকে দৃষ্টি।

'আমরা ঠিক জানি না কখন চার্জগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে। কবির চৌধুরীর দশ মিনিটের আর মিনিট তিনেক বাকি।' খুব উৎকণ্ঠার সাথে দুজনেই রূপা ও রানার প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ করছে।

'মেজর জেনারেল যা করছেন বুঝেশুনে করছেন, এই কামনাই করি।' মন্তব্য করল জেনারেল ব্রুনো। 'আচ্ছা, যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কবির চৌধুরীকে পাওয়া গেছে?'

'না।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মশিয়ে পম্পেদু, 'তবে আমার

বিশ্বাস মেজর জেনারেল রাহাত খান যা করছেন বুঝেশুনেই করছেন।'

২.০০…১.৫৯….গুনে চলেছে ঘড়িটা।

ঘোরানো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রানা তার নিজের ব্যবহার করা সেই দড়িটা ধরার চেষ্টা করছে। বাতাসে দুলছে সেটা, তবু শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও দড়ি লক্ষ্য করে। কপাল ভাল, বাতাসের ঝাপটায় একেবারে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিল দড়িটা। সময় ফুরিয়ে আসছে, অনিবার্য হয়ে উঠছে ঝুঁকি নেয়া। দড়ি বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে দোল খেয়ে তৃতীয় চার্জের খুঁটির কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছে রানা। পায়ের কাছে একটা গার্ডার দেখে ঠেলে দোলার বেগ বাড়িয়ে দিল সে। বিপজ্জনক গতিতে ছুটে যাচ্ছে পুবের খুঁটিটার দিকে। এক হাত দিয়েই ধরতে হলো একটা গার্ডার। কিন্তু শিশিরে ভিজে আছে ওটা- হাত পিছলে গেল। ফিরতি পথে আরেকটা গার্ডারের সঙ্গে ধাক্কা খেল। আবার পা দিয়ে গার্ডারে ধাক্কা দিয়ে পুব দিকের খুঁটিতে পৌঁছার চেষ্টা করল সে। এবার হাত ফসকাল না আর। ধরে ফেলেছে রানা একটা গার্ডার শক্ত হাতে। দড়িটা দুই হাঁটুর মাঝে ধরে বোমাটার দিকে মনোযোগ দিল। কয়েকটা সেকেন্ড কাটল রুদ্ধশ্বাসে। তারপর ডেটোনেটরটা বের করে এনেই ফেলে দিল সেটা নিচে।

উত্তর খুঁটির বোমাটা রয়ে গেছে এখনও। রূপা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওখানে পৌঁছতে। দড়িতে ঝুলে পেন্ডুলামের মত দোল খাচ্ছে সে।

খেপে যাওয়া কোন অ্যাক্রোব্যাটের মতই এখন রানা বীম বেয়ে উপরে উঠছে সড়-সড় করে। মিসেস জোনসকে পিঠে নিয়ে নিচে নামার সময়ও এত ঝুঁকি ও নেয়নি। একটা আই বীমের ওপর

দিয়ে দৌড়ে ছুটে গেল রানা উত্তরের খুঁটিটার দিকে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ভয়ের অনুভূতি আর কাজ করছে না রানার মধ্যে।

সেকেন্ড গুনে চলেছে ঘড়ি ০.২৩...০.২২...০.২১...

ভয় ডর হারিয়েছে রূপাও- উল্টো দিক থেকে সে-ও দৌড়ে ছুটে আসছে উত্তর খুঁটিটার দিকে। দুজনেই এক সাথে হাত বাড়াল- খালি গার্ডারটা খামচাচ্ছে ওরা!

'চার্জটা গেল কই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে হয় ওপরেরটাতে রয়েছে!' জবাব দিল রূপা। কান্নার মত শোনাল ওর গলাটা।

তরতর করে উঠে গেল রানা। রূপাও উঠছে।

ঘড়িতে চার সেকেন্ড মাত্র বাকি।

কোনকিছু ভাবারও সময় নেই এখন।

দুই সেকেন্ড!

প্লাস্টিক চার্জে আঙুল ঢোকাল রানা। ডেটোনেটরটা বের করেই ছুঁড়ে মারল নিচের দিকে!

এক সেকেন্ড... জিরো... ডেটোনেশন!

কয়েক ফুট নিচে শূন্যেই শব্দ করে ফুটল ডেটোনেটরটা। আগে ফেলে দেয়া ডেটোনেটর তিনটেও ফুটল একই সাথে।

কপালের ঘাম মুছল রানা। যুক্তি, ভয় সবই ফিরে পেয়েছে সে এখন। বুঝল কত অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে ওরা। যে কোন জিনিস ওপর থেকে ছেড়ে দিলে প্রথম সেকেন্ডে পড়ে বত্রিশ ফুট- আর ওটা ফুটেছে মাত্র ছয় ফুট নেমেই! অর্থাৎ আর এক সেকেন্ড দেরি হলেই রূপা সহ সে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

কিন্তু আর ভয় নেই- এখন সে, রূপা আর আইফেল টাওয়ার, সবাই বিপদ মুক্ত।

সীন নদীর ধারে প্রশস্ত পানির পাইপের মুখ খুলে গেল। তিনটে বিরাট কোলবালিশের মত ব্যাগ ভেসে উঠল নদীতে। প্রায় সাথে সাথেই একটা মাথা ভেসে উঠল সেগুলোর পাশে।

চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সাঁতার কেটে ব্যাগগুলোর দিকে এগোল কবির চৌধুরী। ওগুলো সংগ্রহ করে বিউ মুচের পাড়ে নোঙর করা ব্যাটিউ মুচে নামের বোটটার দিকে সাঁতরে গেল।

মিনিট তিনেক পরে আর একটা মাথা ভেসে উঠল একই জায়গায়। সে-ও সতর্কভাবে তাকাল চারদিকে- দেখল দড়িতে বেঁধে ব্যাগ তিনটে একটা বোটে তুলছে কবির চৌধুরী। নিঃশব্দে রওনা হলো সে ওই বোটের দিকে। ক্রলিং করলে বেশি শব্দ হবে বলে বুক সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডেভিড।

ব্যাগগুলো বোটের পিছনদিকের কেবিনে রেখে সামনে গিয়ে নোঙরের দড়ি খুলে দিল কবির চৌধুরী। পিছন দিককার দড়ি খুলতে এসে সাঁতরে এগিয়ে আসা লোকটার ওপর নজর পড়ল তার। চশমা ঠিকঠাক করে ভাল করে লক্ষ করল সে। ডেভিডকে চিনতে কোন ভুল হলো না। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল তার। বোটের ইঞ্জিন স্টার্ট দিল সে- বোতাম টিপতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

গিয়ারের লিভার টেনে রিভার্স করে দিল কবির চৌধুরী। তারপরেই দিল ফুল থ্রটল। দ্রুত বোটটা পিছিয়ে আসছে ডেভিডের দিকে।

ছিন্ন ঝুলন্ত স্ট্র্যাপ সহ গিয়ার ব্যারেলটা ভেসে যেতে দেখে কবির চৌধুরীর মৃদু হাসি ধীরে ধীরে বিকশিত হলো পরিপূর্ণ দেঁতো

হাসিতে।

আবার পাইলট কেবিনে ঢুকে গিয়ার লিভার পালটে সামনে এগোবার ব্যবস্থা করল কবির চৌধুরী। সীনের বুকে চলাচলকারী বোটগুলোর সঙ্গে এটার একটাই মাত্র তফাৎ- অন্যগুলোর মত এটা আলোয় ঝলমল করছে না। খুব সামান্য আলো জ্বলছে এই বোটে। চট করে কাপড় বদলে নিল কবির চৌধুরী। টাওয়ার থেকেই নিয়ে এসেছিল নতুন ছদ্মবেশের উপকরণ।

উজানের দিকে ছুটে চলেছে এখন কবির চৌধুরীর বোট।

বোটটা সোজা তার দিকে ছুটে আসতে দেখেই স্ট্র্যাপ খুলে ডুব দিয়েছিল ডেভিড। তার মাথার এক হাত ওপর দিয়ে চলে গেল বোটের ঘুরন্ত চাকা- ছিন্নভিন্ন করে দিল বিয়ার ব্যারেলের স্ট্র্যাপ। বোটের পাশে ঝোলানো সারিবদ্ধ বড় বড় রবারের টায়ারের একটা ধরে বোটের গায়ে সেঁটে থাকল সে।

একবার উঁকি মেরে দেখল, পোশাক পাল্টাচ্ছে কবির চৌধুরী। অর্থাৎ তার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়েছে, ডেভিড এখন ছিন্নভিন্ন একটা লাশ।

সুযোগমত রেলিং টপকে বোটের ডেকে নামল ডেভিড। তারপর সোজা এগিয়ে গেল হুইল হাউসের দিকে। কাঁচের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে কবির চৌধুরীকে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সে। ডেভিডের আগমন ধরা পড়ে গেছে তার চোখে লাগানো ওই অদ্ভুত যন্ত্রটায়। উবু হয়ে কাঠের পায়ের ভিতর গোপন কুঠরি থেকে বের করল একটা লম্বা ফলার ধারাল ছুরি।

বাতির আলোয় ফলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল একবার। পিছিয়ে গেল ডেভিড। মুহূর্তের মধ্যে দরজা ঠেলে ডেকে বেরিয়ে এল

কবির চৌধুরী।

অতি সাবধানে গোল হয়ে ঘুরছে ওরা। ডেভিডের ওপর সতর্ক নজর রেখেছে কবির চৌধুরী। মোটেও অবাক হয়নি সে ডেভিডকে দেখে। টাওয়ারটা এখনও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তাতেও বিস্ময় বা দুঃখ নেই কবির চৌধুরীর। টাওয়ারের মুক্তিপণ সে পেয়ে গেছে। ও জানে, তার সহকর্মীদের মধ্যে একজনই শুধু পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার যোগ্যতা রাখে, সে হচ্ছে ডেভিড ফ্রস্ট।

ঘটনাচক্রে তাই হয়েছে। তবে ডেভিডের কাছে কোন অস্ত্র নেই বুঝে আশ্বস্ত হলো কবির চৌধুরী। অভিজ্ঞ ছুরিবাজদের মতই নেচে নেচে ঘুরছে সে। ছুরিটা হাতের মুঠোয় ওপরের দিকে মুখ করে ধরা। প্রত্যেকটা চাল তার মাপা- নির্ভুল।

কিন্তু ডেভিডও সি আই এর ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট- যে কোন রকম নিরস্ত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ট্রেনিং শেষ করেছে সে। পরে নিজেও হয়েছিল ট্রেনার। ছুরির বিরুদ্ধে খালি হাতে লড়া তার কাছে নতুন কিছু নয়। খুব ভাল করেই জানে সে ছুরিবাজের সুবিধে আর অসুবিধেগুলো কোথায়। দুর্বলতার সুযোগ নেয়ার অনেক রকম কায়দাই তার রপ্ত করা আছে- আর সুবিধেগুলোকে দক্ষতার সঙ্গে তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কৌশলও জানে সে।

আপ্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে গেল সে কবির চৌধুরীর দিকে। যেন ভয় পেয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে এক পা পিছিয়ে গেল কবির চৌধুরী। পরক্ষণেই স্প্রিঙের মত ঝটকা দিয়ে এগিয়ে গেল তার হাত, ডেভিডের হৃৎপিণ্ড বরাবর বিদ্যুৎবেগে ছুরি চালিয়েছে সে।

ডেভিডের পুরো চালটাই ছিল প্রতিপক্ষকে লাফিয়ে আক্রমণ করতে প্রলুব্ধ করা। বুলফাইটারের মত ঝট করে ডান দিকে সরে

গেল সে- সঙ্গে সঙ্গে ডান পায়ের একটা জোর লাথি চালাল কবির চৌধুরীর পা লক্ষ্য করে।

জায়গা মতই পড়ল লাথিটা- ঠিক হাঁটুর একটু নিচে পিছন দিকে। ব্যথায় ককিয়ে ওঠার আগেই আর একটা লাথি পড়ল দুই উরুর মাঝখানে। ওটা আরও দুই ইঞ্চি বাঁয়ে লাগলে মুহূর্তে 'মিস্টার' থেকে 'মিস'-এ পরিণত হত কবির চৌধুরী।

উবু অবস্থায় থাকতেই ডেভিড এগিয়ে গেল আবার- ভীষণ বেগে তার হাঁটু গিয়ে লাগল কবির চৌধুরীর চিবুকের ওপর।

দুটো দাঁত আলগা হয়ে গেল নিচের পাটি থেকে। চোখে এখন শর্ষেফুল দেখছে কবির চৌধুরী। ছুরি ধরা হাতের কব্জি ধরে ফেলল ডেভিড বাঁ হাতে। তারপর হাতে মোচড় দিল কষে।

ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল কবির চৌধুরীর মুখ- শব্দ করে ডেকের ওপর পড়ল ছুরিটা। যেন ডেভিডের হাতে চলে যাওয়ার জন্যেই। জোর এক ধাক্কা দিল সে কবির চৌধুরীকে।

হেলিকপ্টারের শব্দটা ধীরে ধীরে জোরাল হচ্ছে। আশার আলো দেখতে পাচ্ছে কবির চৌধুরী। নির্দিষ্ট সময়েই এসে গেছে পাইলট। ছুরি তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডেভিড।

'কি চাও তুমি? টাকা? মুক্তিপণের টাকা থেকে একটা বখরা চাও- এই তো?' বলে উঠল কবির চৌধুরী। টাকা দিয়ে হলেও বাঁচতে চায় সে।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডেভিড। 'না, টাকায় আমার লোভ নেই, কবির চৌধুরী।'

'তাহলে আমার কাছে কি চাও তুমি?'

অনেকক্ষণ কঠিন ভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ডেভিড কবির চৌধুরীর চোখের দিকে। হেলিকপ্টারটা এখন মাথার ওপর চক্কর

দিচ্ছে।

'প্রতিশোধ!' বলল ডেভিড। 'চার বছর আগে লিবিয়ায় তুমি একটা সন্ত্রাসবাদী দলের কাছে রাশিয়ান অস্ত্র বিক্রি করেছিলে- মনে পড়ে?' জিজ্ঞেস করল ডেভিড।

মাথা ঝাঁকাল কবির চৌধুরী। চোয়ালে হাত বুলাচ্ছে সে।

'একজন সি.আই.এ. এজেন্ট তোমার পিছু নিয়েছিল- তুমি তার গাড়িতে বোমা লুকিয়ে রেখেছিলে- মনে পড়ে?' উত্তেজনায় এক ধাপ চড়ে গেছে ডেভিডের গলা।

কাঁধ একটু ওপরে তুলে ঠোঁট উল্টে জবাব দিল কবির চৌধুরী, 'এই খেলায় অনেক অপ্রিয় কাজই করতে হয়।

'অপ্রিয়? হ্যাঁ, অবশ্যই অপ্রিয়। বিশেষ করে আমার জন্যে। কারণ সি. আই.এর সেই এজেন্ট মারা পড়েনি ওই বিস্ফোরণে- মারা পড়েছিল তার স্ত্রী, তাদের প্রথম বাচ্চা পেটে নিয়ে।'

ডেভিডের উদ্ভ্রান্ত চোখের দিকে চেয়ে কবির চৌধুরীর মুখ থেকে অবজ্ঞার ভাবটা মিলিয়ে গেল। একটা ঢোক গিলে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্ত্রী?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড। ক্রুদ্ধ এক ঘৃণায় চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে তার। 'সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দিনরাত আমি তোমার পিছনে ঘুরছি, কবির চৌধুরী। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।' ধীরে ধীরে এগোল ডেভিড কবির চৌধুরীর দিকে।

ঠিক এই সময়ে হেলিকপ্টারের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ডেকের উপর। উপরের দিকে চেয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল ডেভিডের। সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করল কবির চৌধুরী। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুইল হাউসের পাশে পড়ে থাকা লোহার রডটা তুলে নিল। ডেভিড ছুরি হাতে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারল

ডাণ্ডাটা ডেভিডের দিকে। সোজা গিয়ে লাগল ওটা মাথার পাশে। টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে- ছুরিটা ছিটকে পড়েছে নদীতে। এগিয়ে এসে লোহার ডাণ্ডাটা আবার তুলে নিল কবির চৌধুরী। দুহাতে ডাণ্ডাটা তুলে নিয়ে মারতে উদ্যত হলো সে- এখনই ছাতু করে দেবে ডেভিডের মাথা। তার আগেই হেলিকপ্টার থেকে একটা দড়ির সিঁড়ি ঝপ করে পড়ল কবির চৌধুরীর ওপর। দড়ির জালে ফেঁসে গেল রড- শেষ বাড়িটা আর মারা হলো না। হেলিকপ্টারের পাইলট মুখ বের করে হাতের ইশারায় তাড়াতাড়ি করতে বলল কবির চৌধুরীকে।

ব্যাগ তিনটে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল কবির চৌধুরী। হেলিকপ্টারটা উঠে গেল অনেক উপরে।

'আরও জলদি ওঠাও!' চিৎকার করে বলল কবির চৌধুরী। বেশ উপর দিয়ে চলছে এখন হেলিকপ্টার। সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছাকাছি চলে এসেছে সে। একটা হাত বেরিয়ে এল- শক্ত করে কবির চৌধুরীকে ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল হাতটা।

'স্বাগতম, আপনার জন্যেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি আমরা।' প্যারিসের পুলিস কমিশনার রীতিমত বাউ করে সম্ভাষণ জানাল।

বিমূঢ় কবির চৌধুরীর চোখ ঘুরে ফিরে বার বার দেখছে মেজর জেনারেল রাহাত খান, রানা আর পুলিস কমিশনারকে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

কমিশনারের সঙ্গী দুজন পুলিস তখন হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে কবির চৌধুরীর হাতে।

হোটেল রিজ- রুম ৮১২, মেজর জেনারেল রাহাত খানের স্যুইট। একটা সোফায় বসে আছেন মেজর জেনারেল। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে

তাঁকে আজ। তাঁর চার পাশে ঘিরে বসেছে রানা, রূপা, সোহানা, আলবার্তো ভেরিনো, পুলিস কমিশনার আর ডেভিড।

আলোচনার বিষয়- ডেভিড। তার ব্যাপারে অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে সবার কাছে।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করলেন রাহাত খান, 'ডেভিড, তোমার কাছ থেকে কিছু কৈফিয়তের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তুমি কবির চৌধুরীর হয়ে কাজ করতে করতে হঠাৎ দল বদল করলে কেন?'

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে ডেভিডের উত্তরের অপেক্ষায়।

একটু অপ্রস্তুত ভাবেই ডেভিড জবাব দিল, 'না, দল বদল তো করিনি- সব সময়েই আমি কবির চৌধুরীর বিপক্ষে ছিলাম।'

'তবে কবির চৌধুরীর জন্যে জেনারেল বুমারের ছদ্মবেশে ল্যাপ লেজার গানগুলো কে চুরি করেছিল?' প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন মেজর জেনারেল।

'আমিই করেছিলাম,' জবাব দিল ডেভিড, 'কিন্তু, সেটা আমাকে করতে হয়েছিল তার বিশ্বাস অর্জনের জন্যে, তার দলে ঢোকার জন্যে।'

'এটা তোমার স্বপক্ষে কোন জোরাল যুক্তি হলো না, ডেভিড। কারও দলে ঢোকার বা তার বিশ্বাস অর্জন করবার জন্যে অন্যায় করলেও সেটা অন্যায়ই- তার জন্যে মানুষকে শাস্তি পেতে হয়।' ডেভিডের জবাবে সন্তুষ্ট নন রাহাত খান।

'একটা জোরাল যুক্তি আছে আমার। মিস সুজানা মনরো- মানে মিস রূপাকে আমি প্রথম দেখায় চেনার পরও তাকে কবির চৌধুরীর কাছে ধরিয়ে দিইনি- এটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে আমি আপনাদের হয়ে তার বিরুদ্ধে কাজ করছিলাম?' জবাব দিল

ডেভিড।

চোখ তুলে তাকালেন রাহাত খান রূপার দিকে। 'হ্যাঁ, ডেভিড ঠিক বলছে। প্রথম দেখাতেই আমরা পরস্পরকে চিনেছিলাম- কিন্তু আমার পরিচয় ফাঁস করেনি ডেভিড,' বলল রূপা।

'আমি এখনও ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লেন মেজর জেনারেল। 'তুমি বলতে চাইছ, বেগতিক দেখে দল পাল্টাওনি, তুমি বরাবরই আমাদের দলে ছিলে, আমাদের অজান্তে আমাদের হয়ে কাজ করছিলে তুমি; তোমার কাজকর্মেও তাই দেখা যাচ্ছে, রূপাকে চিনতে পেরেও চেপে গেছ, তাড়া করে গিয়ে ধরার চেষ্টা করেছ কবির চৌধুরীকে। একটু ব্যাখ্যা করে বলবে, এত সব করেছ তুমি কিজন্যে?'

খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল ডেভিড। তারপর বলল, 'প্রতিশোধ।'

'প্রতিশোধ?'

'হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ।'

ঘরের মধ্যে সবাই চুপ। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন রাহাত খান, 'তুমি কবির চৌধুরীর দলে ভিড়লে কি করে?'

'আলবার্তো ভেরিনোর মাধ্যমে,' জবাব দিল ডেভিড।

কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল রাহাত খানের। কই, ঘুণাক্ষরেও তো এ-কথাটা তাঁকে জানায়নি সে?

'কি ব্যাপার, আলবার্তো? ডেভিড যা বলছে, ঠিক?'

ম্লান মুখে মাথা ঝাঁকাল আলবার্তো।

'আমাকে জানাওনি কেন?' জবাবদিহি চান রাহাত খান।

'জানাইনি তার কারণ, আমি চেয়েছিলাম এক পক্ষ বিফল

হলেও যেন অন্য পক্ষ কাজ উদ্ধার করে বেরিয়ে আসতে পারে।'

'কবির চৌধুরীকে শায়েস্তা করাটা তোমার জন্যে এতই দরকার?' জানতে চাইলেন রাহাত খান। 'তোমারও কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে বুঝি ওর বিরুদ্ধে?'

কোলের ওপর রাখা হাত দুটো গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে আলবার্তো ভেরিনো।

'ডেভিড তার স্ত্রীর নামটা বলেনি, তাই না? ওর নাম ছিল মারিয়া ভেরিনো- আমার একমাত্র মেয়ে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল, তারপর জানতে চাইলেন, 'তা এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ, ডেভিড?'

'ঠিক করিনি কিছুই।' বিষণ্ন সুরে জবাব দিল ডেভিড।

'সি. আই. এ তে তোমার ফিরে যাওয়ার উপায় নেই- তুমি ইউনাকোতে জয়েন করো না কেন? তোমার মত লোকের দরকার আছে আমাদের।'

'ইউনাকো যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করে তাহলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব।' ডেভিডের চোখেমুখে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। রানা, রূপা আর সোহানা আগে থেকেই তাদের প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছে। বাইরে এসে ডেভিডকে প্রস্তাব দিল রানা, 'চলো আজ রাতে আমরা চারজন সেলিব্রেট করব।'

'তোমার রান্না করা মাইসনার মেশিন পিস্তল আর থমসন মেশিনগানের সুফ্লে যদি খেতে না হয়, তা হলে রাজি আছি আমি।' হাসতে হাসতে বলল ডেভিড।

'না আজকে তোমাদের সবাইকে খাঁটি সুফ্লে অউ ক্রিভেট

দিমোল খাওয়াব, শ্যাম্পেনের সাথে।' জবাব দিল রানা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল ওরা। পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে সবাই, এমন সময় রানার হাতটা টেনে ধরল সোহানা, 'ওই দেখো...'

দূরে আঙুল দেখাল সে।

একসঙ্গে সেদিকেই তাকাল রানা, রূপা আর ডেভিড।

অটল গাম্ভীর্য নিয়ে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে আইফেল টাওয়ার। যেন কিছুই হয়নি।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল সবার ঠোঁটে।

***

মাসুদ রানা-১২

একখণ্ডে সমাপ্ত

জিম্মি

আবার দেখা যাচ্ছে কবির চৌধুরীকে।
তিনজন লোক চাই তার। একজন আধুনিক যন্ত্র বিশারদ, দ্বিতীয় জন কম্পিউটার বিশারদ, আর তৃতীয় জনকে হতে হবে ইলেকট্রিক ওয়েলডিঙে দক্ষ—সার্কাসের লোক।
উচ্চতা সম্পর্কে ভয়শূন্য হতে হবে তিনজনকেই।
কেন ? ব্যাপারটা কি ? তিনজন লোক...
না, না। আরও অনেক লোকই তার দরকার। কিন্তু তাদের সে নিজেই সংগ্রহ করে নেবে। আলবার্তো ভেরিনো এই তিনজনকে সংগ্রহ করে দিলেই চলবে।

বড়সড় একটা কাজে হাত দিয়েছে এবার কবির চৌধুরী।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আগের সেই দশ বিলিয়ন ডলার তো বটেই,
আরও দশ বিলিয়ন আদায় করে নেবে সে জরিমানা।

বেচারা জানে না, একদা-দুর্ধর্ষ গুণ্ডা আলবার্তো ভেরিনো এখন মেজর জেনারেল রাহাত খানের লোক।
আর রাহাত খান মানেই ...

টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী